প্রকাশনার ৮০ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ২৮ ❖ ৯ - ১৫ আগস্ট, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

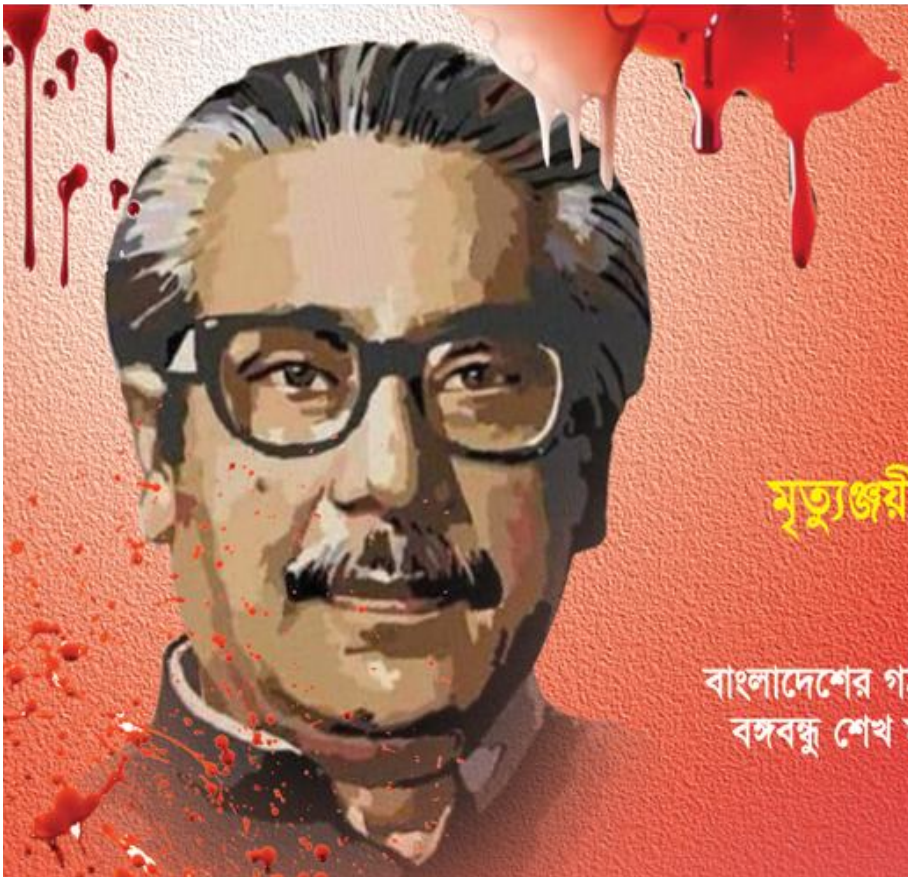

মৃত্যুঞ্জয়ী মুজিব

বাংলাদেশের গঠন ও উন্নয়নে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান

আদিবাসী তুমি আদিবাসীই থাকো

জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ও আদিবাসী জনগণের প্রত্যাশা

শোক সংবাদ

প্রয়াত এন্ড্রু বিশ্বাস (আন্দ্রিয় বিশ্বাস)
জন্ম : ১২ আগস্ট, ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ৮ জুন, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

এন্ড্রু বিশ্বাস (আন্দ্রিয় বিশ্বাস) গত ৮ জুন ২০২০ খ্রিস্টাব্দ ভোর ৬:২০ মিনিটে সদাপ্রভুর ডাকে সাড়া দিয়ে বরিশালস্থ বান্দ রোড, দক্ষিণ আলেকান্দা নিজ বাড়িতে পরলোগমন করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। ঐ দিনই বিকাল ৫টায় বরিশাল কাথলিক চার্চ কবরস্থানে তাকে সমাহিত করা হয়। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, দুই ছেলে, দুই মেয়ে, দুই নাতি ও তিন নাতনি, একজন মেয়ে জামাই, এক পুত্র বধুসহ অসংখ্য আত্মীয় স্বজন ও শুভাকাঙ্ক্ষী রেখে যান।

জন্ম স্থান:

প্রয়াত এন্ড্রু বিশ্বাস (আন্দ্রিয় বিশ্বাস) গোপালগঞ্জ জেলার সাধুল্লাপুর ইউনিয়ন, নারিকেলবাড়ী ধর্মপল্লী, পলোটনা পুকুরপাড় বিশ্বাস বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম স্বর্গীয় আনন্দ বিশ্বাস, মাতার নাম স্বর্গীয় সরোজনী বিশ্বাস। তিনি পাঁচ ভাই ও দুই বোনের মধ্যে সবার বড় ছিলেন।

কর্মজীবন:

এন্ড্রু বিশ্বাস বরিশাল সুনামধন্য উদয়ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। পরবর্তিতে বরিশাল ওয়াই.এম.সি.এ. এর সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। অবসর জীবনে তিনি সরকারী ও বেসরকারী ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানে ঠিকাদারী করতেন।

প্রার্থনা যাচনা :

পরম করুণাময়ের কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন বাবার আত্মাকে চিরশান্তি দান করে স্বর্গবাসী করেন। আমেন।।

শোকার্ত প্রয়াত এন্ড্রু বিশ্বাসের পক্ষে তার পরিবারবর্গ।

বিজ্ঞ/১২৮/২০

NOTRE DAME UNIVERSITY BANGLADESH
CAREER OPPORTUNITY

NDUB is Inviting Applications from competent and self-motivated individuals to fill up the following positions

POSITION	REQUIREMENTS
Office Admin	• Master's degree with CGPA minimum 3.00 in any discipline • Microsoft Word, Excel, Access, Powerpoint and Photoshop edit. • Excellent communication skills for both writing & speaking, in Bangla & in English • Effective public speaking ability • Must be able to maintain relationship with different originations • Experienced individuals are encouraged to apply
Last date of Application	18 August 2020

Apply with complete CV by post and should attach necessary documents as describe in the CV and sent to the Deputy Registrar, Notre Dame University Bangladesh, 2/A, Arambagh, Motijheel, GPO Box 7, Dhaka-1000. Website: www.ndub.edu.bd; Email: info@ndub.edu.bd

Only short-listed candidates will be called for the interview.

বিজ্ঞ/১২১/২০

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮০, সংখ্যা : ২৮
৯ - ১৫ আগস্ট, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
২৫ - ৩১ শ্রাবণ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড

ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়

সুনীল পেরেরা
জ্যাষ্টিন গোমেজ
জাসিন্তা আরেং

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি

সংগৃহীত, ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন

মেরী তেরেজা বিশ্বাস

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স

দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং

৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক

চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

E-mail : wklypratibeshi@gmail.com
Visit : www.weekly.pratibeshi.org

সম্পাদকীয়

চিরঞ্জীব শেখ মুজিব

১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দের ১৫ আগস্ট, বাংলাদেশের জাতীয় জীবনের এক কালো অধ্যায়। কেননা এই দিনেই জাতি হারিয়েছে তার গর্ব, আবহমান বাংলা ও বাঙালির আরাধ্য পুরুষ, স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি, ইতিহাসের মহানায়ক, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। পিতা হারিয়ে জাতি হয়েছে শোকে স্তব্ধ ও বেদনায় নীল। সবচেয়ে বেশি কষ্টদায়ক যে, জাতির পিতৃহত্যায় নেতৃত্ব দেয় এদেশেরই কিছু মানুষ। কিছু অকৃতজ্ঞ ও বিপদগামী দেশি-বিদেশী মানুষ মুজিবের চেতনাকে ধ্বংস করার লক্ষ্যে তাঁকে সপরিবারে হত্যা করে বাংলার বুকে কলঙ্কের ইতিহাস রচনা করে। পরবর্তী সময়ে অনেকে চেষ্টা করেছে ইতিহাসকে বিকৃত করে ভিন্ন দিকে প্রবাহিত করতে। কিন্তু সত্য আপন আলোয় উদ্ভাসিত হতে থাকে। জাতির জনকের হত্যাকারীরাও শাস্তির সম্মুখীন হতে থাকে। বিশ্বাস করি দেশ-বিদেশের সদিচ্ছাসম্পন্ন মানুষের সহযোগিতায় ও কূটনৈতিক তৎপরতায় বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারী সকলেই অচিরেই যথোপযুক্ত শাস্তির আওতায় আসবে। যখন তা সম্পন্ন হবে তখন জাতি অভিশাপমুক্ত হবে।

বাঙালি জাতির ইতিহাসে সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল একটি নাম শেখ মুজিবুর রহমান। বাংলার মানুষকে তিনি যেমন অকৃত্রিমভাবে ভালবেসেছেন, বাংলার মানুষও তাঁকে পিতা ও বন্ধু বলে যোগ্য প্রতিদান দিচ্ছেন। আসলে ঈশ্বর-ই বাঙালি জাতিকে ভালবেসে এ মহান নেতাকে উপযুক্ত সময়ে এ পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। যিনি নিজ জীবনের বিনিময়ে বাঙালির স্বাধীনতা, উন্নতি ও সমৃদ্ধি কামনা করেছেন। জনসাধারণের কল্যাণ ছিল তাঁর নীতি ও প্রশাসনের ভিত্তি। বাংলার সমৃদ্ধ ঐতিহ্য সম্প্রীতি ও শান্তির প্রতি তাঁর ছিল বিশেষ অনুরাগ। আর তাই তো প্রকৃত মুসলমান হয়েও ধর্ম নিরপেক্ষতাকে জাতীয় মূলনীতিতে নিয়ে এসেছিলেন। পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধে প্রোথিত অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার দর্শন ছিল জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের। যে বাংলাদেশে গরীব-দুঃখী, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, নারী-পুরুষ তথা জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই যার-যার অধিকার নিয়ে ও দায়িত্ব পালন করে সুখে শান্তিতে বসবাস করবে। ধর্মীয় গোঁড়ামী, অন্যায়ের কাছে নতি, দল-গোষ্ঠী-স্বজনপ্রীতি ছিল তাঁর নীতি বিরোধী। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে গড়ে তুলতে তিনি কৃষির উপর বিশেষ জোর দেওয়ার সাথে-সাথে বিভিন্ন শিল্প-বাণিজ্যেরও প্রসার ঘটান। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও কূটনীতিতে দেখান মুন্সিয়ানা। দেশের মানুষ ও জাতির উন্নয়নের জন্য সম্ভবপর সকল কর্মসূচীই বঙ্গবন্ধু গ্রহণ করেন। দরিদ্র বাংলাদেশকে সমৃদ্ধ করতে তিনি আমরণ চেষ্টা করেন। বিশেষভাবে দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া মানুষের প্রতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছিল বিশেষ দরদ ও ভালবাসা। ফরাসী দার্শনিক বার্ণার্ড লেভি বলেছেন, বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্বের দুঃখী মানুষের নেতা। তার মতে, এই ধরণী যুগে-যুগে যত মহামানবের জন্ম দিয়েছে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তাদের মধ্যে অন্যতম এবং অনন্য। শেখ মুজিবের কারণেই বাংলাদেশের সৃষ্টি। তাই দেশ ও জাতির প্রতিটি মানুষের অন্তরে শেখ মুজিব চিরঞ্জীব।

অনেকে মনে করেন, মানবতা, সত্য-ন্যায়ের জন্য বলিষ্ঠতা এবং মানুষের কল্যাণ করার দৃঢ়চেতনা শেখ মুজিব পেয়েছিলেন নিজ পরিবার ও মিশনারী স্কুলে পড়াশোনা করার কারণে। যিশু খ্রিস্টের শিক্ষা 'তারা সকলে যেন এক হয়' এবং সবকিছুতে মানুষের মঙ্গল ও কল্যাণ করা দেখতে পাই বঙ্গবন্ধুর জীবন দর্শনে। প্রকৃতপক্ষে জাতির জনকের নেতৃত্বে একতাবদ্ধ থেকেই তো বাংলার মানুষ স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনেছিল। একইভাবে তাঁর দর্শনে পরিচালিত হয়ে বাংলাদেশ সমৃদ্ধ হবে তা বিশ্বাস করি। করোনাকালীন এই কঠিন বাস্তবতাকে জয় করতে হবে বঙ্গবন্ধুর মত সাহসিকতা ও একতার সন্নিবেশ ঘটিয়ে। সকলকে সুযোগ দানের সংস্কৃতি শুরু করা দরকার বাংলার সার্বিক উন্নয়নের জন্য। আর এই সুযোগ থেকে আদিবাসী জনগোষ্ঠী যেন কোনভাবেই বাদ না পড়ে।

বঙ্গবন্ধু যেমনি আদিবাসীদেরকে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখেছেন সকল রাজনৈতিক দলগুলোও যেন তাই করেন। রাজনৈতিক ইস্যু না বানিয়ে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে যেন দেখেন। আদিবাসীরাও সকলের মতোই সমান মর্যাদাসম্পন্ন বাংলাদেশের নাগরিক। মুক্তিযুদ্ধে যেমন দেশ গঠনেও তেমনি আদিবাসীগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছেন। বাংলাদেশের সকলে একসাথে দেশের উন্নয়নে কাজ করে সোনার বাংলা গড়ে তুলে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে চিরঞ্জীব করে রাখবো॥ ✝

"যিশু তখনই শিষ্যদের নির্দেশ দিলেন যেন তাঁরা নৌকায় গিয়ে উঠে আগে আগে ওপারে যান; ইতিমধ্যে তিনি লোকদের বিদায় দেবেন। লোকদের বিদায় দেবার পর তিনি একাকী হয়ে প্রার্থনা করার জন্য পর্বতে গিয়ে উঠলেন। সন্ধ্যা হলে তিনি সেখানে একাই ছিলেন।" - মথি: ১৪:২২-২৩

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

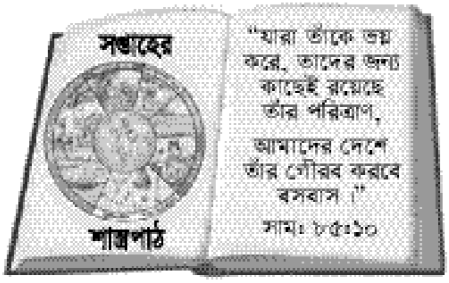

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ৯ - ১৫ আগস্ট, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

৯ আগস্ট, রবিবার

১ রাজাবলী ১৯: ৯, ১১-১৩, সাম ৮৫: ৮-১৩, রোমীয় ৯: ১-৫, মথি ১৪: ২২-২৩

১০ আগস্ট, সোমবার

সাধু লরেন্স, ডিকন ও সাক্ষ্যমর

২ করি ৯: ৬-১০, সাম ১১১: ১-২, ৫-৬, ৭-৮, ৯, যোহন ১২: ২৪-২৬

১১ আগস্ট, মঙ্গলবার

সাধ্বী ক্লেয়ার, কুমারী, স্মরণ দিবস

এজেকিয়েল ২: ৮–৩: ৪, সাম ১১৯: ১৪, ২৪, ৭২, ১০৩, ১১১, ১৩১, মথি ১৮: ১-৫, ১০, ১২-১৪

১২ আগস্ট, বুধবার

সাধ্বী জেন ফ্রান্সেস দ্য শাতাঁল, সন্ন্যাসব্রতী, স্মরণ দিবস

এজেকিয়েল ৯: ১-৭, ১০, ১৮-২২, সাম ১১৩: ১-৬, মথি ১৮: ১৫-২০

১৩ আগস্ট, বৃহস্পতিবার

সাধু পনশিয়ান, পোপ এবং হিপ্পোলিটাস, যাজক, সাক্ষ্যমর, স্মরণ দিবস

এজেকিয়েল ১২: ১-১২, সাম ৭৮: ৫৬-৫৯, ৬১-৬২, মথি ১৮: ২১–১৯: ১

১৪ আগস্ট, শুক্রবার

সাধু ম্যাক্সিমিলিয়ান কোল্‌বে, যাজক ও সাক্ষ্যমর, স্মরণ দিবস

এজেকিয়েল ১৬: ১-৫, ৬০, ৬৩, (অথবা এজেকিয়েল ১৬: ৫৯-৬৩)

সাম (ইসাইয়া) ১২: ২, ৪-৬, মথি ১৯: ৩-১২

১৫ আগস্ট, শনিবার

শনিবারে ধন্যা কুমারী মারীয়ার স্মরণে খ্রিস্টযাগ

এজেকিয়েল ১৮: ১-১০, ১৩, ৩০-৩২, সাম ৫১: ১০-১৩, ১৬-১৭, মথি ১৯: ১৩-১৫

১ বংশাবলী ১৫: ৩-৪, ১৫-১৬; ১৬: ১-২, সাম ১৩১: ৬-৭, ৯-১০, ১৩-১৪, ১ করি ১৫: ৫৪-৫৭, মথি ১৯: ৩-১২

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

৯ আগস্ট, রবিবার

+ ১৯২২ সিস্টার এম. সেন্ট ইউফ্রেজী আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)

১০ আগস্ট, সোমবার

+ ১৯৫৩ ফাদার মাথিয়াস জে. অসওয়াল্ড সিএসসি (ঢাকা)

১১ আগস্ট, মঙ্গলবার

+ ১৯৪৫ সিস্টার এম. ইউফ্রেজিয়া গ্রিফিন সিএসসি
+ ১৯৬০ ফাদার বেনিতো রোতা এসএক্স (খুলনা)
+ ২০০১ সিস্টার মেরী বার্ণার্ড এমসি (ঢাকা)

১২ আগস্ট, বুধবার

+ ১৮৯৭ ফাদার বনে রোচ সিএসসি
+ ১৯৬০ ব্রাদার যোসেফ কিসুম (দিনাজপুর)

১৩ আগস্ট, বৃহস্পতিবার

+ ১৯০৬ সিস্টার এম হিলারী আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৪৩ সিস্টার এম. কলম্বা ক্ল্যানসি সিএসসি
+ ১৯৮০ ফাদার চেষ্টার স্লাইডার সিএসসি (ঢাকা)

১৪ আগস্ট, শুক্রবার

+ ১৮৫৫ ফাদার মিশেল ভয়সিন সিএসসি
+ ১৯৭২ ফাদার আঞ্জেলো মাজ্জিওনি পিমে (দিনাজপুর)
+ ২০১৫ সিস্টার মেরী কণিকা এসএমআরএ (ঢাকা)

১৫ আগস্ট, শনিবার

+ ১৯৯৮ সিস্টার দামিয়েন বুশে সিএসসি

কোভিড-১৯ পরবর্তীতে আদিবাসীদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসা

করোনাকালে বিশ্বের সকল আদিবাসীদের জীবনে যেন এক অনাকাঙ্ক্ষিত স্থবিরতা নেমে এসেছে। যার ফলশ্রুতিতে আদিবাসীদের আর্থ-সামাজিক জীবনে বেশ প্রভাব পড়েছে। বর্তমানে আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী মহামারী নভেল করোনাভাইরাসের ফলে পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত হয়েছে। তারা করোনায় আক্রান্ত না হয়েও করোনার সাথে প্রতিনিয়ত লড়াই করে যাচ্ছে এবং মানবেতর জীবন-যাপনে বাধ্য হচ্ছে। যেহেতু আদিবাসীদের বেশিরভাগ লোকই অভাব-অনটন এবং দারিদ্র্যে জর্জরিত, এই করোনাকালে তাদের অবস্থা শোচনীয় এবং অবর্ণনীয়। কোভিড-১৯ এর ফলে আদিবাসীরা কর্মহীন হয়ে পড়ায় খাবার, চিকিৎসা এবং ঔষধপত্র কিনতে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। বলা যায় যে, তারা তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণ করতেই রীতিমত হিমশিম খাচ্ছে। তাছাড়া যারা বিভিন্ন সবজি, ফলমূল উৎপাদন করে এবং পাহাড়ী বন থেকে লাকড়ী কেটে বাজারজাত করার সাথে সম্পৃক্ত, তাদের শতকরা ৮৫ ভাগই সামাজিক সুরক্ষার বাইরে অবস্থান করছে। ভাষা ও সংস্কৃতিগত ভিন্নতা এবং তাদের মাতৃভাষায় সুরক্ষা বিষয়ক জ্ঞানের কমতি থাকার ফলে সুযোগ-সুবিধা গ্রহণের ক্ষেত্রেও বিঘ্নের সৃষ্টি হচ্ছে। অন্যদিকে, প্রত্যন্ত এলাকায় আদিবাসীদের বসবাসের ফলে তারা প্রতিনিয়ত সরকার কর্তৃক প্রদানকৃত ত্রাণ গ্রহণ থেকেও বঞ্চিত হচ্ছে। আমাদের দেশের কিছু এলাকার আদিবাসী সম্প্রদায়ের কাছে কোভিড-১৯ প্রতিরোধে সাবান দিয়ে হাত ধোয়াটাও কঠিন একটি কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেখানে আদিবাসীদের অধিকারসমূহ প্রশ্নবিদ্ধ, সেখানে এই জাতীয় সংকটকালে তাদের সামাজিক সুরক্ষার নিশ্চয়তা প্রদান করা কতখানি সম্ভব হচ্ছে তা নিয়ে রয়েছে ঘোর সংশয়।

এদিকে, কোভিড-১৯ প্রতিরোধে জাতি-জনগোষ্ঠী নির্বিশেষে সকলের সেবা, বিশেষ করে আদিবাসীদের সেবাদানের ক্ষেত্রে জাতিসংঘ বিশেষ নির্দেশনা প্রদান করেছে। জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল আন্তনীও গুতেরেস্ বলেন যে, কোভিড-১৯ মহামারী সকল মানব সংকটের উর্ধ্বে এবং তা প্রায় সকলকেই কম-বেশি প্রভাবিত করছে, তাই আদিবাসী সম্প্রদায়সহ সকল সম্প্রদায়ের স্বাস্থ্যগত এবং সামাজিক সুরক্ষা-ব্যবস্থা নিশ্চিত করা একান্ত জরুরী। তাছাড়া, সরকারের পক্ষ থেকে কোভিড-১৯ মোকাবেলায় আদিবাসীদের সম্পৃক্ততা এবং সচেতনতা বৃদ্ধিতে যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করা অত্যন্ত আবশ্যক। অন্যদিকে, FAO (Food and Agricultural Organization), অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ করোনাকালীন এবং করোনা পরবর্তী স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি কমাতে এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে আদিবাসী প্রতিনিধি, স্বেচ্ছাসেবক এবং উদ্যোগীদের সম্পৃক্ত করার জন্য প্রতিটি দেশের সরকারকে আহ্বান জানিয়েছে। যেন আদিবাসীরা নিজ ভাষায় তাদের স্বাস্থ্যগত সমস্যার কথা জানাতে পারে এবং সেইমত সেবা গ্রহণ করতে পারে। এই আন্তঃসাংস্কৃতিক সেবাদানের মাধ্যমে আদিবাসীদের নানাবিধ সমস্যার সমাধান এবং কোভিড-১৯ প্রতিরোধে স্থানীয়দের সেবাদানের আওতায় নিয়ে আসাই এর মূল লক্ষ্য। কাজেই, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক প্লাটফর্মে টেকসই উন্নয়ন ব্যহত হওয়া রুখতে সংস্কৃতি ও বৈষম্যের উর্ধ্বে গিয়ে কোভিড-১৯ প্রতিরোধে সকলকেই এগিয়ে আসতে হবে।

সর্বোপরি, কোভিড-১৯ একটি জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংকট যার নির্মম শিকার বিশ্বের আদিবাসী সম্প্রদায়সমূহ। এই সংকটকালীন এবং পরবর্তীতে আদিবাসীদের স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তন এতটা সহজ হবে না। তাদের আর্থ-সামাজিক জীবনে যে চড়াই-উৎরাই সৃষ্টি হয়েছে, তা অন্যান্য কঠিন সময়ের মতই প্রতিহত করতে সক্ষম হবে বলে বিশ্বাস করি। ২০২০ খ্রিস্টাব্দের আদিবাসী দিবসে কোভিড-১৯ জয় এবং পরবর্তীতে সংগ্রামের দৃঢ় অঙ্গীকার লালন করে আদিবাসী জনগোষ্ঠী সম্ভাবনার পথে নির্ভয়ে এগিয়ে যাক মনে-প্রাণে সেই বাসনাই করি।

জাসিন্তা আরেং
ময়মনসিংহ থেকে

ফাদার মুকুল আন্তনী মণ্ডল

সাধারণকালের ১৯শ রবিবার (ক)

১ম পাঠ : লেবীয় গ্রন্থ ১৯: ৯, ১১-১৩ পদ।
২য় পাঠ : রোমীয়: ৯: ১-৫ পদ।
৩য় পাঠ : মথি ১৪: ২২-৩৩ পদ

প্রভু যিশুর উপস্থিতি আমাদের সার্বক্ষণিক সহায়: খ্রিস্টেতে ভাইবোনেরা, যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন সেই পিতা ঈশ্বরের শক্তি, ক্ষমতা ও অনুগ্রহ আমাদের বিপদে-আপদে সর্বসময় উপস্থিত থাকে। নিরাকার হিসেবে যতটুকু দূরত্ব অনুভব করতাম, তাও নৈকট্য লাভ করেছে প্রভু যিশুর শারীরিক উপস্থিতির মাধ্যমে। সৃষ্টির শুরু থেকে আমাদের যাত্রা-পথ ঝুঁকিপূর্ণ। প্রতিদিন আমরা বিভিন্নমুখী ঝড়-তুফানরূপ বাধা-বিঘ্ন, দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ-আপদের সম্মুখীন হই। সেই সব মুহূর্তে আমাদেরকে ঈশ্বরের ওপর নির্ভরশীল ও আস্থাবান হতে শিখতে হবে। আর যারা তা শিখে, তারাই ঈশ্বরের শক্তি, সাহায্য, সাক্ষাৎ ও সান্নিধ্য লাভ করে। আর তখনই একজন খ্রিস্টভক্ত নির্ভয়ে, নিঃসংশয়ে এগিয়ে যেতে পারে যে কোন দুর্গম পথে বা সংকটের মধ্যদিয়ে।

হতাশা-ব্যর্থতায় ঈশ্বর নিজে প্রবক্তা এলিয়ের সহায়: আজকের প্রথম শাস্ত্রপাঠে দেখতে পাই যে, তৎকালে ইস্রায়েল দেশের উত্তরাঞ্চলের রাজা-প্রজা সবাই যখন প্রবক্তা এলিয়ের কথা আর শুনছিল না, তখন তিনি ক্ষোভে ও দুঃখে দক্ষিণাঞ্চলে চলে যান। সেখানে গিয়ে হোরেব পর্বতের গুহায় আশ্রয় নেন। তখন ঈশ্বর তার ক্ষুব্ধ মনকে শান্ত করার জন্য তার সামনে এসে উপস্থিত হন- এক প্রকার মৃদু-মন্দ বাতাসের আকারে। ঈশ্বরের সাক্ষাৎ পেয়ে এলিয় আবার নতুন চেতনা, আশা, উৎসাহ ও উদ্দীপনা লাভ করেন এবং আবার উত্তরাঞ্চলে (দামাস্কাতে) ফিরে গিয়ে সেখানকার দু'জন রাজা ও তাদের উত্তরাধিকারকে এক ঈশ্বরের ভক্ত হওয়ার জন্য অভিষিক্ত করেন। সেখানে তখন সহজেই ঈশ্বরের রাজ্য বিস্তার লাভ করতে থাকে। উৎকণ্ঠা ও উদ্বিগ্নতা নিয়ে অন্যের ক্ষতি করি এমনটা ঈশ্বর চান না বরং তিনি চান অশান্ত চিত্ত সমাহিত করে আমরা যেন সদা আনন্দে ও কল্যাণকাজে নিরত থাকি।

জীবনের ঝড়-ঝঞ্ঝায় প্রভু যিশু নিজে আমাদের সহায়: মঙ্গলসমাচারে আমরা দেখতে পাই যে, যিশুর শিষ্যেরা ও অন্যান্য লোকেরা, যারা নৌকোতে উঠার আগে পেট ভরে খেয়েছিল, তারা পার্থিব খাদ্য অর্থাৎ রুটি খাওয়ার পর ঈশ্বরকে ধন্যবাদ না জানিয়ে অথবা কোনরূপ প্রার্থনা না করেই তাদের গতানুগতিক কর্মময় জীবনস্রোতে গা ভাসিয়ে দিল। আর তারা তাদের জীবন নৌকাতে খ্রিস্ট প্রভুকে তুলে নেওয়ার প্রয়োজন মনে করলো না। তাঁকে তারা ভুলে গেল সংসারের কাজে পড়ে। অর্ধেক পথ পাড়ি দিতে না দিতেই খ্রিস্টের প্রতি তাদের বিশ্বাস কমে যেতে লাগলো। তারা তাদের সীমিত শক্তি ও সামর্থের *(যেমন: নৌকা, বৈঠা, পাল, বাহুবল ইত্যাদি)* উপর নির্ভর করেই নিজেদের স্বার্থে এক সংসার সমুদ্রপাড়ি হতে আর এক অনন্ত জীবনের সমুদ্রের পাড়ে পাড়ি জমাতে চেয়েছিল। কিন্তু যাত্রা পথ যে কতো কঠিন ও ঝুঁকিপূর্ণ তা তারা তখনি বুঝতে পারলো, যখন তারা দেখলো যে, সমুদ্রে প্রবল বাতাস উঠেছে, বড় বড় ঢেউ ও ক্ষিপ্ত জল নৌকাকে ডুবিয়ে দিচ্ছে এবং যিশু তাদের বাঁচানোর জন্য পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তারা যিশুর দিকে তাকিয়ে ভয় পেলেও যিশু অভয় দিয়ে বলতে শুরু করেন, "এ তো আমিই, ভয় করো না, সাহস করো।" যিশু একাধারে শিষ্যদের সাহস যোগান, অন্যদিকে ঝড়-তুফানকেও ধমক দিয়ে শান্ত করেন। এখন আমাদের কতো না উচিত দৈহিক, মানসিক, আত্মিক ও প্রাকৃতিক যে কোন সংকটে যিশুর উপর দৃঢ় বিশ্বাস ও আস্থা রাখা।

খ্রিস্টের প্রতিনিধি যাজকগণ আমাদের পাশে আছেন: প্রতিটি চার্চের যাজকগণ আমাদের দৈহিক, মানসিক, আত্মিক ও প্রাকৃতিক যে কোন সংকটে যিশুর প্রতিনিধি হিসেবে দিন-রাত চব্বিশ ঘন্টা আমাদের সার্বিক কল্যাণের জন্য নিয়োজিত থাকেন। বিষয়টি হয়তো অনেককে তাক লাগিয়ে দিতে পারে, তবে আসলে তাই। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে, অনেক ভক্তজনগণ ওই শিষ্যদের মতো চার্চবিহীন কিংবা যাজকবিহীন জীবন-যাপন করে থাকেন। অনেকে নিজ চার্চের যাজকদের নামই জানেন না। তারা তাদের জীবন নৌকাতে যাজকের পবিত্র হাত দু'টির ব্যবহারের প্রয়োজন মনে করেন না। তারা পবিত্র ও সংস্কারীয় কাজে তাদের ব্যবহার না করে শুধু সার্টিফিকেট, সুপারিশ, ওয়ারিশপত্র, বিচারাচার ও জাগতিক চাওয়া-পাওয়া নিয়ে সাক্ষাৎ করে থাকেন তাও বিশেষ প্রয়োজনে। অথচ জগত ও জীবনের সার্বিক যে কোন বিষয়ে পবিত্রকারি স্পর্শ ও আশির্বাদের জন্য যাজকদের সাথে যোগাযোগ বিনিময় অব্যাহত রাখার কথা। (অবশ্য আহ্বানের স্বল্পতা একটি ব্যতিক্রমধর্মী দুর্বল দিক থাকতে পারে)। তাই আমরা যেন যথাসাধ্য তাদের ব্যবহার করি, প্রার্থনা, পরামর্শ বা সমর্থন খুঁজি। তাতে আমাদের জীবনের হতাশা, ব্যর্থতা, বিষাদ, অশান্তি, অতৃপ্তি, অপরাধবোধ, নৈতিক অবক্ষয় ইত্যাদি অনেকাংশে কমে যাবে। তাই তাদের ভূত মনে করে আমাদের জীবন নৌকার বাইরে না রাখি।

দলনেতা/গৃহকর্তাদের প্রতি প্রভুর আহ্বান: আমরা বিশ্বাস বৃদ্ধি বা দৃঢ় করতে দেরী করি তা কিন্তু প্রভু যিশু কখনো চান না। তিনি তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেন আমাদের বিশ্বাস দৃঢ় করতে। তিনি মণ্ডলীরূপ নৌকার চালক পিতরকেই এক পরীক্ষা করে দেখান। "পিতর, তুমিও আমার মত জলের উপর দিয়ে হেঁটে আসো।" হাঁটতে গিয়ে যখন ভয়ে তলিয়ে যাচ্ছিলেন, তখনই যিশু তাকে রক্ষা করতে হাত বাড়িয়ে ধরলেন এবং বললেন, "হে অল্পবিশ্বাসী, কেন সন্দেহ করলে?" পিতরও এই ঘটনায় গভীরভাবে যিশুকে উপলব্ধি করে স্বীকার করলেন যে, "হ্যাঁ, সত্যিই আপনি ঈশ্বরের পুত্র।" দলনেতা পিতরের মতো আমরা যারা বিশেষ করে দলনেতা, সমাজপতি, সংগঠন পরিচালক ও গৃহকর্তা রয়েছি, আমাদের কত না উচিত দৈনন্দিন জীবনের সর্বক্ষেত্রে বিশ্বাসের জীবনের চর্চায় নিজেকে ও অন্যদেরকে পরিচালনা করা যাতে সকলকে শীতল শান্ত নদীর ধারে চড়াতে পারি।

জীবনের কেন্দ্রে যিশুর স্থান: আমরা যারা রাষ্ট্র, মণ্ডলী, সমাজ এবং পরিবারের নেতা ও কর্তা, যে কোন সংকটে যিশুকে বিশ্বাস ও উপলব্ধি করার জন্য যিশু প্রত্যাশা করেন। আমাদের আদর্শ দেখে অন্যেরা শিখবে বিভিন্ন সংকট পরিস্থিতিতে প্রথমে যিশুর শরণাপন্ন হতে। আমাদের সংসার জীবনে

কোন ঘটনা ঘটলেই বড় মামা, বড় কাকা, বড় নেতা, বড় পুলিশ ইত্যাদির আশ্রয় নিয়ে প্রমাণ করি যে, আসলে আমরা ধার্মিক নই। আমরা আমাদের সামান্য নৌকা, বৈঠা, পাল, বাহুবল ইত্যাদির মধ্যে সীমিত। যিশুকে দূরে রাখি। বাংলাদেশে অধিকাংশ ধর্মহীন লোকেরা কেস-মামলায় সর্বস্ব শেষ করার পরে হয়তো ফিরে আসে ধর্মের কাছে। তাও হয়তো নতশিরে আসে না, আসে অভিশাপের মন নিয়ে, "প্রভু, ওকে তুমি সাইজ করিও।" অথচ সংকট শুরু হওয়ার মুহূর্ত থেকে যিশু আমার পাশে ছিলেন। কিন্তু মামা কাকা ও পুলিশকে ডাকতে গিয়ে যিশুকে রেখেছি ভূতের স্থানে। ক্ষমা করো প্রভু যিশু।

প্রভুর কারণে শুধু সংসার-নৌকা নয় বরং সমাজচ্যুত হলেও ক্ষতি নেই: দৈহিক, মানসিক, আত্মিক ও প্রাকৃতিক যে কোন সংকটে যিশুর উপর দৃঢ় বিশ্বাস ও আস্থা রেখে যদি সমাধান পাওয়াই যায়, তাহলে জাগতিক এমন কোন্ শক্তি থাকে প্রভুর সান্নিধ্য থেকে আমাদের দূরে রাখে? সাধু পল রোমীয়দের কাছে খ্রিস্টের সেই মহত্ত্বের কথা ঘোষণা করেছেন। শুধু তাই নয় তিনি তার স্বগোত্র ইহুদী ভাইদের জন্য প্রথমতঃ বিশেষ মমতা, সহানুভূতি ও করুণা প্রকাশ করেছেন। সাথে সাথে তিনি আবার দুঃখ প্রকাশ করে বলেছেন যে, ইহুদীরা অর্থাৎ স্বগোত্রের মানুষেরা ঈশ্বরের বিভিন্ন সন্ধি, সান্নিধ্যের মহিমা, মোশীর বিধান, উপাসনা পদ্ধতি ও যত সব প্রতিশ্রুতি পাওয়া সত্ত্বেও খ্রিস্টপ্রভুকে ক্রুশবিদ্ধ করেছিল, অর্থাৎ তাঁর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। তাই পৌল তাঁর ইহুদী ভাইদের প্রতি হৃদয়বিদারক বাণী ঘোষণার ব্যর্থতা নিয়ে সমাজচ্যুত হতেও প্রস্তুত, যাতে তিনি অইহুদীদের কাছেও খ্রিস্টের মঙ্গলবাণী প্রচার করতে পারেন। শেষ পর্যন্ত তিনি তাই করেছেন, নিজের গোত্রের পরিচয় বিসর্জন দিয়ে খ্রিস্টের নামে নিজেকে সঁপে দিয়েছেন।

সর্বশক্তির আধারকে সর্বদা সঙ্গে রাখি: তাই প্রিয়জনেরা, আসুন আমাদের প্রতিদিনকার জীবনে, বাস্তব সংকটে যখন অভক্তি ও অবিশ্বাসের কারণে যিশুর নামটি ভূতের মতো ভয়ঙ্কর ও অর্থহীন মনে হয়, প্রভুর আত্মিক প্রেরণা যেন আমাদের প্রাণ-দ্বীপে নতুন করে জ্বেলে দেন বিশ্বাস ও ভক্তির আলো; ভবপার থেকে পরপারে অগ্রসর হতে সর্বশ্রেষ্ঠ উপাসনা পদ্ধতি খ্রিস্টযাগ/রুটি-দ্রাক্ষারস, যা মোশী নয় স্বয়ং প্রভু যিশু স্থাপন করেছেন তার প্রতি তাকিয়ে বলতে পারি "সত্যি আপনি ঈশ্বরের পুত্র, তুমি যে আমার গৃহে প্রবেশ করবে, আমি তার যোগ্য নই; বরং শুধু তোমার বাক্য ও প্রসাদগুণে আমি ও আমার আত্মা সর্বপ্রকার অভাব ও সংকট থেকে মুক্তি পাবে।" আসুন, সেই গভীর উপলব্ধি চেয়ে খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করি॥

আদিবাসী তুমি আদিবাসীই থাকো

(১২ পৃষ্ঠার পর)

৯. ছেলেদেরকে শিক্ষিত হতে হবে এবং অলস না থেকে বিভিন্ন কর্মে নিয়োজিত থেকে নিজেদেরকে সাবলম্বী করে তুলতে হবে।

১০. কালা হোক বোবা হোক নিজ জাতির ছেলেকে বিয়ে করা।

বাংলায় একটি প্রবাদ বাক্য আছে, "দুধ খাও, ঘি খাও ভাতের মতো হয় না; মাসি থাক পিসি থাক মায়ের মতো হয় না"। আদিবাসী মেয়েরা যত বড় স্বপ্ন নিয়ে, উচ্চ আকাঙ্ক্ষা নিয়ে অন্যধর্মীদের কাছে চলে যাক না কেন তারা তাদের জীবনে কখনোই সুখি হয় না। কারণ তাদের সংস্কৃতি আমাদের সংস্কৃতি অনেক আলাদা। তাদের চিন্তার সাথে আমাদের চিন্তা কখনোই মিলে না। তাদের নৈতিক জীবন আমাদের নৈতিক জীবন আলাদা। আর যে জিনিসটা সবচেয়ে ভিন্ন সেটি হলো তাদের মনের সাথে আমাদের মনের মিল হয় না। আপনারা জানেন, যে পরিবারের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মনের মিলন থাকে না সেই পরিবার সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে পারে না। তাই আমরা আদিবাসী, আদিবাসী হয়েই থাকি। আদিবাসী হয়ে থাকার জন্য একে-অপরকে সাহায্য-সহযোগিতা করি। পরিশেষে, কবি-লেখক, প্রাবন্ধিক ফাদার গৌরব জি. পাথাং -এর কবিতার মধ্য দিয়ে আদিবাসী মেয়েকে বলতে চাই...

নিথুয়া, তুমি আদিবাসী মেয়ে আদিবাসীই থাকো
থাকো মাথায় দওমি দিয়ে দক্‌মান্দা পরে
ওদের চাকচিক্য বিলাসীতা দেখে অইখানে যেও নাকো
যেও নাকো ভুল পথে, এসো আমারই ঘরে।
অইখানে যেও নাকো, তাদের সাথে বলো নাকো কথা
বলো আমারই সাথে তোমারই মনের দুঃখ ব্যথা।
ওরা নাগ-নাগিনী হয়ে ছোবল দিবে তোমারই গায়
তাই অইখানে যেও নাকো, যেও নাকো একা
গভীর বনে ঝর্ণার কলতানে, শ্যামল ছায়ায়
ঝিরঝির বাতাসে আমার যদি না পাও দেখা
তবুও তুমি যেও নাকো একা
প্রেমের নীলাকাশে মেলে রঙিন পাখা॥

২০২০ খ্রিস্টাব্দ

সিস্টার অনুপমা কস্তা সিআইসি

বিশে বিশ সাল,
মানুষের জীবনে এসেছে
বিস্ময়কর এ'কি আকাল।
অজানা অদৃশ্য, ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র কোভিড-১৯
মানুষকে করে ফেলেছে ভালবাসাহীন।
যে মানুষ পেয়েছে এর দর্শন
বেঁচে থাকলে এর ভয়াবহতার কথা
ভুলবে না কোনজন।
বিশ্বের লাখ মানুষ হারিয়েছে প্রাণ
মানবজাতির উপর সৃষ্টিকর্তার এ কি অভিমান।
মানব জাতি আজ কৃতকর্মে অনুতপ্ত
ওগো ভুবনেশ্বর থেকো না তুমি আর মৌন।
পারছি না মোরা মেনে নিতে
তোমার এই অজানা পরিকল্পনা
তাই বলে তুমি আমাদের ভুল বোঝ না।
অস্থির প্রাণচঞ্চল এই বিশ্বটা
তোমার কাছে নতো স্বীকার করে
লজ্জায় দিয়েছে যেন, লম্বা করে ঘোমটা।
হারাতে চাই না আর কোন প্রিয়জনকে
মুক্ত কর প্রভু এই মহামারীর
অভিশপ্ত, ভয়াবহ ছোবল হতে॥

বইয়ের আর্তনাদ

সপ্তর্ষি

সাদা কাগজে কালো কালি দিয়ে
আমাকে পাতায় পাতায় সাজিয়ে
অনেক জ্ঞানের সাজানো কথা লিখে
দিয়েছে মানুষের হাতে বই আকারে।

আধুনিকতার ছোঁয়া ব্যস্ত মানুষ
মোবাইল ফোনটি যেন হয়েছে আপন
তর্জনী চলে অবিরত ফেইসবুকের পাতায়
হাতটি কখনো পড়ে না মোর পাতায়।

আমাকে সবাই সেলফি তুলে দিয়ে
তালা বন্দি করে সাজিয়েছে
রাখে স্মার্ট ফোনটি দু'হাতে যতনে ধরে
হয়তো আবার বুকের উপর রাখে।

দুর থেকে ফোনটি অট্টহাসি হেসে
তিরষ্কার দিয়ে বলছে মোরে উচ্চস্বরে
যেথায় তোমার স্থান হয়নি এই জনমে
সেথায় আমি থাকি অনেক আপন হয়ে।

পুরনো এক জড়ো পদার্থ হয়েছি বলে
আজ পারি না কোন প্রতিবাদ করতে
তাই নতুন প্রযুক্তিকে বলছি আর্তনাদে
সম্মুখে চল কালিতে লেখা বইকে নিয়ে॥

বাংলাদেশের গঠন ও উন্নয়নে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান

ড. আলো ডি'রোজারিও

১। ভূমিকা : ফরাসী দার্শনিক বার্ণার্ড হেনরী লেভি বলেছেন, বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন বিশ্বের দুঃখী মানুষের নেতা। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ছিলেন জনগণের নেতা। তার মতে, এই ধরণী যুগে-যুগে যত মহামানবের জন্ম দিয়েছে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তাদের অন্যতম। তিনি ছিলেন অনন্য। দার্শনিক লেভি আরো বলেন, মুসলিম বিশ্বের অনেক দেশই স্বাধীন হবার পর তাদের সক্ষমতা প্রমাণে ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশ স্বাধীনতার ৫০ বছরে এসে উন্নয়ন ও অবকাঠামো দিয়ে শক্তি ও সক্ষমতা প্রমাণ করেছে। বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা ক্ষমতায় আছেন বলে এটি সম্ভব হয়েছে। বাংলাদেশের অফুরন্ত সম্ভাবনার কথা তুলে ধরে দার্শনিক লেভি বলেন, বাংলাদেশ চীনকেও অতিক্রম করতে পারবে। [১]

বিশ্বে বঙ্গবন্ধুর সমকক্ষ নেতা খুব বেশি নেই। এই ধরণীর মহামানবদের তিনি একজন। তিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি। বাংলাদেশের গঠন ও উন্নয়নে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে অবদান রেখেছেন তা অসামান্য ও সর্ববিদিত। আমার এই প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে, বিভিন্নভাবে ও বিভিন্ন খাতে - বিশেষ করে দেশগঠন ও কূটনীতিতে, অধিকার প্রতিষ্ঠায়, কৃষি ও স্বাস্থ্যে, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় ও শিল্প-বাণিজ্যে বঙ্গবন্ধুর তাৎপর্যপূর্ণ অবদানের কথা।

২। বঙ্গবন্ধুর দেশগঠন ও কূটনীতি : ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে পাকিস্তানের বন্দী শিবির থেকে মুক্তি পাবার পর ১০ তারিখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় আসেন। এরপর তিনি বিচক্ষণ ও অভিজ্ঞ নেতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে বিভিন্ন চড়াই-উৎরাই পার হয়ে একটি বিধ্বংসী যুদ্ধ-পরবর্তী অবস্থা থেকে বাংলাদেশকে সুদৃঢ় ও স্থিতিশীল উন্নয়নের পথে পরিচালিত করতে সমর্থ হন। লণ্ডন হতে ভারত হয়ে ঢাকা আসার পথে দিল্লীর পালাম বিমানবন্দরে ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের ১০ জানুয়ারি বাংলাদেশকে ঘিরে তিনি তাঁর লক্ষ্যের কথা ব্যক্ত করে বলেন যে কারও প্রতি ঘৃণা কিংবা বিদ্বেষমিশ্রিত অনুভূতি নিয়ে নয়, বরং মানসিক উন্মত্ততার বদলে সৎ বিবেচনা, কাপুরুষতার স্থলে সাহস, অশুভের জায়গায় শুভ এবং বিচারহীনতার বিপরীতে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মিথ্যাকে হারিয়ে

শেষ পর্যন্ত সত্যের যে জয় হয়েছে, চিত্তে সে সন্তুষ্টি নিয়ে তিনি তার স্বাধীন ভূমিতে ফিরছেন। একই দিনে দেশে ফিরে তিনি ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বাংলাদেশের বিজয়ী জনগণের উদ্দেশে যে ভাষণ দিয়েছিলেন তাতে রাষ্ট্রশাসন-সংক্রান্ত প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গির স্পষ্ট প্রকাশ ঘটে।

ঢাকায় ফিরে তিনি নির্দেশ দেন বাংলাদেশে অবস্থানরত অবাঙালিদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে। আহ্বান জানান, মুসলিম বিশ্বের দেশগুলোর ও জোটের নেতাদের প্রতি তারা যেন বাংলাদেশের স্বীকৃতিদানে ও পুনর্গঠনে এগিয়ে আসেন। অতঃপর প্রকাশ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ভারতকে তাদের সহযোগিতার জন্যে ধন্যবাদ দেওয়ার পাশাপাশি বাংলাদেশ থেকে তাদের সেনাবাহিনী ফিরিয়ে নিতে অনুরোধ জানান। ভারত সরকার অনতিবিলম্বে তাদের সেনাসদস্যদের সরিয়ে নেয়। বঙ্গবন্ধু ও তাঁর সরকারের আরও একটি উল্লেখযোগ্য অর্জনের মধ্যে রয়েছে যুদ্ধবিধ্বস্থ দেশের সকল নাগরিক ও ভারত হতে ফেরতদের মধ্যে নতুন করে দেশ গড়ার সাহস ও প্রেরণাদান।

পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রেও গভীর মনোযোগের পাশাপাশি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে তাদের কাছ থেকে স্বাধীন বাংলাদেশের স্বীকৃতিপ্রাপ্তির ও কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের ব্যাপারে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে উৎসাহিত করতেন। এই প্রসঙ্গে ঐ সময়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে কর্মরত সাবেক রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ জমির লিখেছেন যে দেশের পররাষ্ট্র নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর সরাসরি সংযোগ ও তার সক্রিয় উদ্যোগে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন, পূর্ব ইউরোপ, জোটনিরপেক্ষ দেশ এবং অন্যান্য কমনওয়েলথভুক্ত দেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কোন্নয়ন সম্ভব হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর আন্তরিক প্রচেষ্টায় ও ঐকান্তিক উদ্যোগে ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রথম বছরপূর্তির পূর্বেই বিশ্বের ৫৪টি দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। তাঁর বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ এবং দূরদর্শী দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে সৌদি আরব, কুয়েত, মিশর, আলজেরিয়া ও সিরিয়ার সাথে সম্পর্কোন্নয়নে সফল হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে ওই দেশগুলো তাদের প্রভাব খাটিয়ে ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারিতে লাহোরে অনুষ্ঠিত অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কো-অপারেশনের (ওআইসি) সম্মেলনে বাংলাদেশকে আমন্ত্রণ জানাতে ওআইসি ও পাকিস্তানকে রাজি করায়। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতি বঙ্গবন্ধুর জোর নির্দেশনা ছিল, অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে ভ্রাতৃত্ব ও ভালো সম্পর্ক বজায় রাখা, জোট নিরপেক্ষতার মৌলিক নীতিমালা মেনে চলা, শান্তিপূর্ণ

সহাবস্থান বৃদ্ধিতে সচেষ্ট হওয়া, পারস্পরিক সহযোগিতার হাত বাড়ানো ও কারো অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা।[২]

বঙ্গবন্ধু সরকারের সফল কূটনৈতিক পদচারণা ও বিচক্ষণ নেতৃত্বের ক্যারিশমায় স্বাধীনতার মাত্র এক বছরের মধ্যে বাংলাদেশ ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে আইএমএফ, আইএলও, আন্তঃসংসদীয় ইউনিয়ন, ইউনেস্কো, কলম্বো প্ল্যান ও গ্যাটের সদস্যপদ লাভ করতে সক্ষম হয়। একই বছরের ৮ আগস্ট বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদের জন্য জাতিসংঘের মহাসচিবের কাছে আবেদন পাঠায়। দুই দিন পর বঙ্গবন্ধু নিরাপত্তা পরিষদের সব সদস্যকে বাংলাদেশকে সমর্থনের জন্য অনুরোধ করে পত্র লেখেন। তেইশ আগস্ট যুক্তরাজ্য, ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও যুগোস্লাভিয়া এক মিলিত প্রস্তাবে বাংলাদেশকে অন্তর্ভুক্তির জন্য নিরাপত্তা পরিষদকে জোরালো সুপারিশ করে। ওই প্রস্তাবে চীনের ভেটো সত্ত্বেও ৩০ নভেম্বর ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে সাধারণ পরিষদ প্রস্তাবটি সুপারিশ করে। অতঃপর ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দের ১৭ সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশ জাতিসংঘের ১৩৬তম স্বাধীন দেশ হিসেবে সদস্যপদ লাভ করে বিশ্বে পরিচিতি পায়।[৩] বর্তমানে বিশ্বের প্রায় সব রাষ্ট্রের সঙ্গে রয়েছে বাংলাদেশের অত্যন্ত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। এর ভিত্তিও রচনা করে গেছেন হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

৩। অধিকার প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধুর অঙ্গীকার ও অবদান: মানবাধিকারের প্রতি বঙ্গবন্ধুর অঙ্গীকার ছিল অবিচল। সর্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণাপত্রে যে ৩০টি অনুচ্ছেদ রয়েছে, তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এর প্রতিটিরই প্রতিফলন রয়েছে আমাদের বাংলাদেশের সংবিধানে। আমাদের সংবিধানের প্রস্তাবনায় সব নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিতকরণের অঙ্গীকার রয়েছে। জাতিসংঘ ঘোষিত সর্বজনীন মানবাধিকারের মূল সুর হলো, প্রতিটি মানুষের সম্মানজনকভাবে বেঁচে থাকার জন্মগত অধিকার – এই জন্মগত অধিকার প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধু ছিলেন অত্যন্ত মনোযোগী ও যত্নবান। সংবিধানের ২৭ অনুচ্ছেদে সব নাগরিককে আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকার দেওয়া হয়েছে। এছাড়া, সংবিধানের ২৮(২) অনুচ্ছেদে রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী-পুরুষের সমান অধিকারের কথা বলা হয়েছে। নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান সময়ের চেয়ে অনেক বেশি এগিয়ে ছিলেন। জাতিসংঘ কর্তৃক নারীর প্রতি সব ধরনের বৈষম্য বিলোপ (সিডও) সনদ-১৯৭৯ গ্রহণের অনেক আগেই বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের সংবিধানে নারী-পুরুষের সমঅধিকারের স্বীকৃতি দিয়েছেন। সিডও সনদের ১৬টি অনুচ্ছেদে নারীর প্রতি বৈষম্য বিলোপে যেসব অনুশাসন দেওয়া হয়েছে, তার প্রতিটি অনুশাসনই বঙ্গবন্ধুর ১৯৭২-এর সংবিধানে বিদ্যমান।[৪] মানবাধিকার, উন্নয়ন ও ন্যায্যতা ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। মানবাধিকারের ভিত্তি দুর্বল হলে উন্নয়ন টেকসই হয় না। উন্নয়নের ফলাফল সর্বস্তরে পৌঁছাতে প্রয়োজন ন্যায্য রাষ্ট্রীয় নীতি ও নৈতিক সামাজিক ব্যবস্থা। সেজন্যে বঙ্গবন্ধু সুখী, সুন্দর ও ন্যায্য জাতি গঠনে মানবাধিকার ভিত্তিক উন্নয়নে সবিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সাম্যবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। সাধারণ মানুষের কল্যাণে এবং সামাজিক বিপ্লবকে সফলতার চূড়ায় পৌঁছে দিতে এই বিশ্বাসবোধই ছিল তাঁর চালিকাশক্তি।

৪। বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের কৃষি : গত শতাব্দীর সত্তরের দশকে কৃষিই ছিল বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান খাত। তখন দেশের জনসংখ্যার সিংহভাগ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষি-নির্ভর ছিল। এই কৃষিকে এবং কৃষিকাজে নিয়োজিত আধপেটা-একপেটা কৃষকদের দেখে দেখেই বড় হয়েছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের দুর্ভিক্ষের ভয়াবহ চিত্র তিনি দেখেছেন আর ছুটে বেড়িয়েছেন গ্রাম হতে গ্রামে বুভুক্ষু মানুষদের খাদ্য সাহায্য দিতে। তখন তিনি দেখেছেন পাকিস্তানি শাসকদের বিমাতাসুলভ আচরণ, বুঝতে পেরেছেন কীভাবে কৃষির প্রতি তাদের চরম অবহেলা এ দেশকে খাদ্য ঘাটতির দেশে পরিণত করেছে। ফলে কৃষি ও কৃষক না বাঁচলে যে দেশ বাঁচবে না এ কথা তিনি যথার্থ বুঝেছিলেন। গ্রামের দরিদ্র কৃষক আর ভুখা-নাঙ্গা মানুষদের ভাগ্যের পরিবর্তন করার জন্যই শুরু হয় বঙ্গবন্ধুর যত আন্দোলন ও যত সংগ্রাম।

উপরে উল্লেখ করা হয়েছে, বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের ১০ জানুয়ারি ঢাকায় ফিরেন। ঢাকায় ফিরে তিনি সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে এ দেশের শাসনভার তুলে নেন নিজ কাঁধে। সরকারেরর দায়িত্ব নেবার পরপরই কৃষির ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি এবং কৃষক যেন ঘুরে দাঁড়াতে পারে সেজন্যে তিনি বেশ কিছু যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ছিল: কৃষকদের মাঝে ১০ কোটি টাকার তাকাভী ঋণ বণ্টন, পাঁচ কোটি টাকার সমবায় ঋণ বণ্টন, ৮৩ হাজার টন সার সংগ্রহ ৫০ হাজার টন সার বণ্টন, ১৬ হাজার ১২৫ টন ধানের বীজ বণ্টন, তিন হাজার মন গমের বীজ বন্টন, এক হাজার ৭০০ টন আলু বীজ বণ্টন, ৪৫৪ টন পাট বীজ বণ্টন, সেচের জন্য ২৯শ' গভীর নলকূপ ও তিন হাজার অগভীর নলকূপ স্থাপন, বিএডিসিকে নামমাত্র মূল্যে পাওয়ার টিলার ও ট্রাক্টর সরবরাহ, নামমাত্র মূল্যে কৃষকদের মধ্যে হালচাষের জন্য এক লাখ বলদ ও ৫০ হাজার দুগ্ধবতী গাভী সরবরাহ, একটানা তিন মাস খাদ্যশস্যসহ ৩০ কোটি টাকার ত্রাণ বিতরণ ও উচ্চহারে ভর্তুকি প্রদানপূর্বক সব ধরনের সারের অতি নিম্নমূল্য নির্ধারণ। এছাড়াও, বঙ্গবন্ধু উদ্বৃত জমি ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বিতরণের লক্ষ্যে পরিবার প্রতি জমির সিলিং ১০০ বিঘা নির্ধারণ করেন। তিনি ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা চিরতরে রহিত করে দেন ও কৃষকদের রক্ষা করেন পাকিস্তানী আমলে রুজু করা ১০ লাখ সার্টিফিকেট মামলা হতে। বঙ্গবন্ধু কৃষি গ্র্যাজুয়েটদের সরকারী চাকুরীতে যোগদান দ্বিতীয় শ্রেণীর মর্যাদা থেকে প্রথম শ্রেণীর মর্যাদায় উন্নীত করার উদ্যোগ নেন। এ বিষয়ে তিনি ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দের ১৩ ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ঘোষণা দেন। তাঁর এই ঘোষণা বাংলাদেশে কৃষিখাতে এক যুগান্তকারী প্রভাব ফেলে কারণ তখন হতে মেধাবী তরুণরা অধিক সংখ্যায় কৃষি শিক্ষায়, কৃষি গবেষণায় ও কৃষি পেশায় যোগদান করতে থাকে।[৫]

বঙ্গবন্ধু কৃষিক্ষেত্রে গতিশীলতা আনতে উপরে বর্ণিত স্বল্পমেয়াদী কিন্তু অতি জরুরী বেশ কিছু পদক্ষেপ নেওয়ার পর কৃষিক্ষেত্রে মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে তিনি মধ্যমেয়াদী লক্ষ্য অর্জন করার দিকে এগিয়ে যেতে শুরু করেছিলেন কিন্তু স্বাধীনতার শত্রুরা তাকে থামিয়ে দেয়। আমাদের দেশের কৃষক-শ্রমিক মেহনতি মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের ভাবনা বঙ্গবন্ধু আজীবন লালন করেছেন। বঙ্গবন্ধু জানতেন, এ দেশের

কৃষক ও গ্রামীণ জনগোষ্ঠী, এ দেশের কৃষি ও মাটির সঙ্গে সম্পৃক্ত। ফলে, উন্নয়নের গতিধারায় এ সম্পর্ক যেন নষ্ট না হয়।

৫। বঙ্গবন্ধুর স্বাস্থ্য ভাবনা ও পদক্ষেপঃ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জানতেন, একটি সুখী-সমৃদ্ধ দেশ গড়তে চাইলে চাই একটি স্বাস্থ্যবান জাতি। বঙ্গবন্ধু তাই একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত স্বাধীন দেশ গড়ার পাশাপাশি দেশের মানুষের স্বাস্থের কল্যণে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। তিনি যেসব পদক্ষেপ নিয়েছিলেন সেসব বিশদভাবে লিখেছেন ডা: কামরুল হাসান খান।[৬] ডা: খান লিখেছেন, শত ব্যস্ততার মাঝেও ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের ৮ অক্টোবর বঙ্গবন্ধু তৎকালীন আইপিজিএমআরএ (বর্তমানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়) কেন্দ্রীয় রক্ত পরিসঞ্চালন বিভাগ উদ্বোধন করতে এসে দেশের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা শিক্ষা নিয়ে এক ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। তাঁর ওই ভাষণে সদ্য স্বাধীন দেশের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা নিয়ে এক দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি ওই ভাষণে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা শিক্ষার পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা, ভাবনা মন খুলে বলেছিলেন। তিনি চিকিৎসক-নার্স-কর্মচারী সবাইকে সম্মিলিতভাবে চিকিৎসা প্রদানে আন্তরিকতার সাথে মনোনিবেশ করার আহ্বান জানান। তিনি চিকিৎসাসেবার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে গরিব রোগীদের মমতা দিয়ে চিকিৎসা প্রদানের নির্দেশ প্রদান করেন। তিনি নার্সদের পদমর্যাদা ও সম্মানের বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে নির্দেশ দেন। সবাইকে অনুরোধ জানান, নার্সদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে। নার্সিং শিক্ষার সুযোগ ও মান বৃদ্ধির জন্যেও বিশেষ তাগিদ দেন। বঙ্গবন্ধুর স্বাস্থ্যবিষয়ক বিভিন্ন পদক্ষেপের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :

১. আইপিজিএমআরকে (পিজি হাসপাতাল) শাহবাগে পূর্ণাঙ্গ ইন্সটিটিউট ও হাসপাতাল হিসেবে স্থাপন;

২. বাংলাদেশ মেডিকেল রিসার্চ কাউন্সিল (বিএমআরসি) প্রতিষ্ঠা;

৩. বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ান এ্যাণ্ড সার্জন প্রতিষ্ঠা;

৪. স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপন;

৫. ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে প্রণীত প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনাকে অধিকতর গুরুত্ব প্রদান;

৬. চিকিৎসকদের সরকারী চাকুরীতে প্রথম শ্রেণীর মর্যাদা প্রদান;

৭. নার্সিং সেবা এবং টেকনোলজির উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠা ও

৮. ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব প্রিভেনটিভ এ্যাণ্ড সোশ্যাল মেডিসিন (নিপসম) প্রতিষ্ঠা;

বঙ্গবন্ধুর স্বাস্থ্য ভাবনার সফল প্রতিফলন আজকের বাংলাদেশে দৃশ্যমান। বঙ্গবন্ধুর তৃণমূল পর্যায়ের চিকিৎসাসেবার জন্য থানা স্বাস্থ্য প্রকল্প আজও বিশ্বে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার এক সমাদৃত মডেল। জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে ১৯৯৬ থেকে ২০০১ এবং ২০০৯ থেকে অদ্যাবধি বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ও মেডিকেল শিক্ষার সব ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করায় আজকে বাংলাদেশ বিশ্বের দরবারে প্রশংসিত। বিশ্বে আজ অনেক ক্ষেত্রেই বাংলাদেশ অনুসরণযোগ্য হয়ে ওঠেছে। স্বাস্থ্য খাতও এর বাইরে নয়।

৬। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শিতা : জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে পরপর দুই মাসে দুটি ভাষণ দিয়েছিলেন। একটি ছিল ২৮ অক্টোবর সাধারণ নির্বাচনের আগে বেতার ও টেলিভিশনে প্রচারিত তাঁর রাজনৈতিক ভাষণ। অন্যটি ছিল ১২ নভেম্বর বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাসের পর ২৬ নভেম্বর সংবাদ সম্মেলনে। বঙ্গবন্ধু তাঁর নির্বাচনী ভাষণে অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি অর্থনৈতিক মৌলিক ভিত্তির প্রথম তিনটি স্তম্ভকে অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা বলেছিলেন। তার মধ্যে প্রথমেই ছিল বন্যা নিয়ন্ত্রণ। তিনি একটি সুসংহত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জলাবদ্ধতা দূর করাসহ ফারাক্কা বাঁধের সম্ভাব্য সর্বনাশের কথাও বলেছিলেন। আটাশ অক্টোবরের সেই নির্বাচনী ভাষণ বাংলার জনগণের মাঝে তুলেছিল তুমুল আলোড়ন। বঙ্গবন্ধুর ২৬শে নভেম্বরের দেয়া ভাষণের মাঝে ছিল আজকের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার পূর্ণাঙ্গ দিক-নির্দেশনা।[৭] বিশ্ববাসীর কাছে তিনি তাঁর নিবিড় পর্যবেক্ষণের মাঝে তুলে আনা দুর্যোগাক্রান্ত জনগণের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরেন। সে বছর নোয়াখালী, বরিশাল, পটুয়াখালী ও খুলনায়, এই চারটি জেলা সফর করে তিনি ১০ লাখেরও বেশি মানুষের প্রাণহানির কথা ও উপদ্রুত এলাকার বেঁচে থাকা মানুষের অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্টের কথা তুলে ধরেন। সেদিনকার সে ভাষণে তিনি স্পষ্ট করে বলেছিলেন, দেশবাসীকে আর একটি ঘূর্ণিঝড় থেকে রক্ষা করতে হলে কি কি পদক্ষেপ নিতে হবে। তাঁর বলা পদক্ষেপগুলোর মধ্যে ছিল:

১. উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ;

২. ঘূর্ণি-প্রতিরোধী পর্যাপ্ত আশ্রয়স্থল নির্মাণ;

৩. সুষ্ঠু বিপদ সংকেত ব্যবস্থা চালু করা;

৪. যোগাযোগ ব্যবস্থার দ্রুত উন্নয়ন করা ও

৫. দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের জন্য পর্যাপ্ত ত্রাণ ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা;

পরবর্তীতে, ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ১৪ মার্চ বঙ্গবন্ধু প্রশাসনকে যে ৩৫টি নির্দেশনা দেন, তন্মধ্যে ঘূর্ণিদুর্গত এলাকায় বাঁধ নির্মাণসহ সব ধরনের উন্নয়নমূলক কাজ, সাহায্য-সহযোগিতা, পুনর্বাসন ও পুনর্নির্মাণ কাজ অব্যাহত রাখার নির্দেশ ছিল। আজকের বাংলাদেশে ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলার জন্য 'ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচী' নামে যে সফল ও জনপ্রিয় কর্মসূচী চালু আছে তা বঙ্গবন্ধুর সরকার ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে পরিকল্পনা করেন এবং বঙ্গবন্ধু ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে এই কর্মসূচীর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। বর্তমানে বাংলাদেশে এই কর্মসূচীর মাধ্যমে লাখ-লাখ স্বেচ্ছাসেবক সেবা দিয়ে যাচ্ছে দুর্গত এলাকার জনগণকে। ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ বিষয়ে বঙ্গবন্ধু যে নির্দেশ দেন তা বাস্তবায়নের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে তিনি মানুষ ও তাদের সম্পদ রক্ষায় উঁচু ঢিবি নির্মাণ করতে বলেছিলেন। স্থানীয় জনগণ ভালবেসে ও কৃতজ্ঞতাভরে সে আশ্রয়স্থলের নাম দেন 'মুজিব কিল্লা'। বর্তমানে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় 'মুজিব কিল্লা' নির্মাণ প্রকল্পসহ উপকূলের জনগণের জন্য পরিকল্পিত আশ্রয়স্থল নির্মাণের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। পাশাপাশি বন্যাদুর্গত এলাকায় তৈরী করা হচ্ছে আশ্রয়স্থল। দুই হাজার নয় খ্রিস্টাব্দে ক্ষমতায় এসে এরই ধারাবাহিকতায় বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে ক্ষতিগস্ত মানুষের জন্য নিজস্ব তহবিল ঘোষণা করেন, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে মানুষ যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হন সেজন্য প্রস্তুতিমূলক বিভিন্ন কর্মকাণ্ড হাতে নেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ হতে পেরেছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার বিশ্বব্যাপী 'রোল মডেল'।

৭। শিল্প ও বাণিজ্যে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনা: ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে বঙ্গবন্ধু দেশে ফিরলে তাঁর জন্যে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায় অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কাঠামো নির্ধারণ ও শিল্প-বাণিজ্য পুনর্জীবিতকরণ। আমাদের সংবিধান তখনো রচিত হয়নি। তবুও, ধারণা ছিল যে সমাজতন্ত্র আমাদের সংবিধানের একটি মূল স্তম্ভ হবে। বস্তুতপক্ষে, সেই ধারণা থেকে বঙ্গবন্ধু প্রত্যাগমনের আগেই তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ বেসরকারী শিল্প-বাণিজ্য জাতীয়করণের ঘোষণা দেন। ঘোষণার আলোকে নেয়া সিদ্ধান্ত অনুসারে পাকিস্তানিদের মালিকানার এবং পরিত্যক্ত সব শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানে ওই সংস্থার উচ্চতম পদের অধিকারী ব্যক্তিকে উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রশাসক নিয়োগ করা হয়। সেই সময় অবশ্য বাঙালি মালিকানার বড়-বড় শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানও জাতীয়করণ করা হয়। অচিরেই এইসব শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান পরিচালনাগত সমস্যার সম্মুখীন হয় এবং তা মূলত অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার অভাবে। এসব প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য দক্ষ কর্মশক্তি আমাদের ছিল না। ফলে উৎপাদন ও তেজারতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বাংলাদেশের শিল্প ও বাণিজ্যের তখনকার অবস্থা সম্পর্কে সাবেক সচিব ইনাম আহমদ চৌধুরী লিখেছেন, 'আমাদের তখন আন্তর্জাতিক বাজার থেকে কেনার মতো বৈদেশিক মুদ্রা ছিল না। বঙ্গবন্ধু তখন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে 'বার্টার' এগ্রিমেন্ট করে পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমোদন দিলেন। আমার মনে আছে, স্বাধীনতার প্রথম দু-তিন বছরে আমরা মুখ্যত পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলোর সঙ্গে পণ্য বিনিময় নিয়ে আলোচনা এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি হিসেবে আমি নয়-দশটি পণ্য বিনিময় চুক্তি সম্পাদন করি, যা তখন হয়ে দাঁড়াল আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্যেরও মূলধারা।'[৬]

স্বাধীনতা-উত্তর সময়ে বাংলাদেশের প্রায় সবকিছুই আমদানী করতে হত, বিপরীতে রপ্তানী করা হত, পাট ও পাটজাত দ্রব্য, চা, চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য, তামাক ও কুটির শিল্পজাত বিভিন্ন দ্রব্য। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দেই বঙ্গবন্ধু ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়ন সফর করেন এবং দুই দেশের সাথে বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক চুক্তি সম্পাদন করেন। ফলে পারস্পরিক সমতা ও সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে সর্বাত্মক সহযোগিতার পথ উন্মুক্ত হয়। এসব চুক্তির ফলস্বরূপ সোভিয়েত ইউনিয়ন এগিয়ে আসে ঘোড়াশালে থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট, চট্টগ্রামে জেনারেল ইলেকট্রিক ম্যানুফেকচারিং প্ল্যান্ট ও উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন রেডিও ট্রান্সমিটার প্রতিষ্ঠা করতে এবং তেল ও গ্যাস অনুসন্ধানে। ভারতও এগিয়ে আসে শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে সহযোগিতার বিভিন্ন প্রস্তাব নিয়ে। দেশের স্বার্থ ও সম্মানের বিষয়টি মাথায় রেখে বঙ্গবন্ধু তখন ভারতের সব প্রস্তাবে মত দেননি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ভারত দান হিসেবে দুটি উড়োজাহাজ ও একটি জাহাজ দিতে চাইলে বঙ্গবন্ধু জানান যে দান হিসেবে এসব নিতে তিনি মত দিবেন না, অনুদান হিসেবে নিতে পারেন যেন পরে মূল্য পরিশোধ করা যায়। বঙ্গবন্ধু এতই দূরদর্শী ছিলেন যে দেশের স্বার্থে ও জনগণের প্রয়োজনে ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দের প্রথমার্ধে সিদ্ধান্ত নেন চীনের সাথে বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করতে, যদিও চীন তখনো পর্যন্ত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়নি।

অর্থনৈতিক, কারিগরি ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক ও চুক্তির ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু কখনও চাইতেন না যে, বাংলাদেশ কোনো এক দেশের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীল হোক। বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব, স্বতন্ত্র সত্ত্বা ও সর্ববিধ স্বার্থ তাঁর বিবেচনায় স্থান পেত। বঙ্গবন্ধু সবসময় চাইতেন, বাণিজ্যিক সম্পর্ককে বিস্তৃততর করতে এবং বাংলাদেশের রপ্তানীকে 'এক পণ্য' নির্ভর না করে তাতে বহুত্ব নিয়ে আসতে। সব বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপনের মূল বিবেচ্য বিষয় ছিল দেশের, সর্বোপরি জনগণের স্বার্থ।

৮। উপসংহার: বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ৩০ লাখ মহান শহীদ ও দুই লাখ মা-বোনের আত্মত্যাগের বিনিময়ে নয় মাসব্যাপী এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে বিশ্ব মানচিত্রে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়। বঙ্গবন্ধু আমাদের দিয়ে গেছেন একটি স্বাধীন দেশ, লাল-সবুজ পতাকা ও বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংবিধান। যেই সংবিধানে রয়েছে চারটি মৌলিক স্তম্ভ: জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা। ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলতে গিয়ে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়। মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান সকলেই নিজ-নিজ ধর্ম পালন করবেন। তাদের বাঁধা দেওয়ার ক্ষমতা রাষ্ট্রের কারো নেই।'

বঙ্গবন্ধু আয়ু পেয়েছিলেন মাত্র ৫৫ বছর। সেই সময়ের মধ্যেই খালি হাতে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলাদেশ। রাষ্ট্র পরিচালনার সময় পেয়েছিলেন মাত্র তিন বছর সাড়ে সাত মাস। এই অল্প সময়ের মধ্যেই রাষ্ট্রগঠন, কূটনীতি ও উন্নয়নের প্রতিটি খাতকে অসীম সাহস, গভীর প্রজ্ঞা ও অনন্য দূরদর্শিতা সহকারে নেতৃত্ব দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের, দেশদ্রোহী চক্রের আকস্মিক আঘাতে তাঁর এবং তাঁর পরিবারের অধিকাংশ সদস্যের প্রাণপ্রদীপ নিভে গেল প্রায় একই সঙ্গে। তাঁর স্বপ্নপূরণের সব কর্মযজ্ঞ ও কর্মকাণ্ড থেমে গেল, কিছু সময়ের জন্য। বঙ্গবন্ধু নিহত হলেন, কিন্তু তাঁর আদর্শ, তাঁর নীতি, তাঁর প্রদর্শিত পথ তো রয়ে গেল আমাদের সামনে আলোকবর্তিকা হিসেবে। তাঁর সেই পথ ধরে, তাঁর সেই স্বপ্নপূরণে, তাঁর চিহ্নিত লক্ষ্যে পৌঁছতে আজ নিরলস প্রচেষ্টারত তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় ও উদ্দীপনায় পরিচালিত দেশগঠনের সকল কর্মকাণ্ডে সর্বাত্মক সহযোগিতা করে আমরা সকৃতজ্ঞত চিত্তে বঙ্গবন্ধুর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে পারি।

সহায়ক সূত্রসমূহ

(১) সমকাল প্রতিবেদন, 'বঙ্গবন্ধু ছিলেন বিশ্বের দুঃখী মানুষের নেতা', দৈনিক সমকাল, ১৪ মার্চ, ২০২০

(২) মোহাম্মদ জমির, 'বঙ্গবন্ধুর দেশ গঠন ও কূটনীতি', দৈনিক সমকাল, ৬ মার্চ, ২০২০

(৩) এ. কে. আব্দুল মোমেন, 'বঙ্গবন্ধু ও তাঁর কূটনৈতিক দর্শন', দৈনিক সমকাল, ২৪ মার্চ, ২০২০

(৪) নাছিমা বেগম, 'অধিকার প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধুর অঙ্গীকার', দৈনিক সমকাল, ৫ মার্চ, ২০২০

(৫) ড. মো. শহীদুর রশীদ ভূঁইয়া, 'বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের কৃষি', ৯ মার্চ, ২০২০

(৬) ডা. কামরুল হাসান খান, 'বঙ্গবন্ধুর স্বাস্থ্য ভাবনা ও পদক্ষেপ', ৭ মার্চ, ২০২০

(৭) ড. মাহবুবা নাসরীন, 'দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শিতা' ১০ মার্চ, ২০২০

(৮) ইনাম আহমদ চৌধুরী, 'শিল্প-বাণিজ্যে বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শিতা', ১২ মার্চ, ২০২০॥

মৃত্যুঞ্জয়ী মুজিব

সুনীল পেরেরা

বাঙালি জাতির জীবনে সর্বাঙ্গীনভাবে একটি কালো দিবস ও এক কলঙ্কময় ইতিহাস ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দের ১৫ আগস্ট। ইতিহাসের সাক্ষী এই দিনটি বাঙালির হৃদয়ে শোক আর বেদনার দীর্ঘশ্বাস হয়ে বার বার ফিরে আসে। এই কালো দিবসেই জাতি হারিয়েছে তার গর্ব, আবহমান বাংলা ও বাঙালির আরাধ্য পুরুষ, স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি, ইতিহাসের মহানায়ক, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে।

১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দের এই কাল রাতে বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান শেখ মুজিবকে এ দেশেরই কিছু বিপথগামী সেনাসদস্যরা পরিবার আত্মীয়স্বজনসহ তাকে নির্মমভাবে হত্যা করে। সমগ্র জাতি এক সাগর ব্যথাভরা হৃদয়ে শোকে মুহ্যমান হয়ে দিবসটি পালন করে। তার অকাল তিরোধানে সদ্য স্বাধীন সোনার বাংলাকে করে দিয়েছে পিতৃহীন এবং তারই মাশুল দিয়ে যাচ্ছে বাঙালি জাতি আজ অবধি।

বঙ্গবন্ধুর কথা মনে হলেই মনে পড়ে যায় দীর্ঘদেহী, সৌম্যশান্ত, প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এক সুপুরুষ যাকে লাখো, কোটি মানুষের ভীড় থেকেও সহজেই চেনা যায়। তার সেই অতি সাধারণ পাজামা-পাঞ্জাবী, কালো মুজিব কোট, চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা, হাতে কালো পাইপ, এ যেন কেবল তারই জন্য। খুব সহজ-সরলভাবে কথা বলতে পারতেন, মানুষকে আপন করে নেবার এক আশ্চর্য শক্তি ছিল। তার জন্যই তিনি বয়োজ্যেষ্ঠ ছাড়া সবাইকে তুই করে বলতে পারতেন, এই সম্বোধনের মধ্যে ছিল তার হৃদয়ের গভীর টান-ভালবাসার টান। অতি সাধারণ জীবন-যাপন করতে তিনি। বিলাসবহুল জীবন ছিল তার খুবই অপছন্দের। তাই তিনি রাষ্ট্রপতি হয়েও সাধারণ মানুষের মত জীবন-যাপন করতেন। তার ছিল না কোন বিলাসবহুল বাড়ি, গাড়ি, ঐশ্বর্য। তার ৩২ নম্বরের বাড়িটি ছিল খুবই সাধারণ মানের। খাঁটি বাঙালির মতই ছিলেন মাছে ভাতে বাঙালি। তিনি ছিলেন অত্যন্ত অতিথিপরায়ণ ও বন্ধুবৎসল। নিজে কখনো আলাদা নিরাপত্তার বেষ্টনীতে থাকতেন না রাষ্ট্রপতি হয়েও। তিনি গভীরভাবে ভালবাসতেন ও বিশ্বাস করতেন বাংলার মানুষকে। তাই নিরাপত্তার প্রশ্নে সর্বদাই বলতেন বাংলার কোন মানুষ আমার কোন ক্ষতি করবে না।

কিন্তু নিয়তির কি নির্মম পরিহাস। দেশী-বিদেশী চক্রান্তকারীদের যোগসাজসে এদেশের কিছু বিপথগামী সেনাসদস্যদের হাতেই তাকে জীবন দিতে হলো। বঙ্গবন্ধুর বিকল্প শুধু বঙ্গবন্ধুই ছিলেন। তাইতো তার তিরোধানের গভীর ক্ষতটি এখনো তীব্রভাবে বিদ্যমান।

তার শৈশব জীবনে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও এ কে ফজলুল হক যখন টুঙ্গীপাড়ায় স্কুল পরিদর্শনে আসেন, তখন স্কুলের দাবী-দাওয়া নিয়ে সর্বপ্রথম এই অকুতোভয় ছাত্র শেখ মুজিবই সামনে এগিয়ে এসেছিলেন। তার সেই তেজোদীপ্ত চেহারা দেখেই সোহরাওয়ার্দী এবং হক সাহেব বুঝতে পেরেছিলেন এই বালকই হবে একদিন দুঃখী বাঙালির কাণ্ডারী এবং হয়েছেনও তাই। পরবর্তীতে মুজিব উপরোক্ত নেতাদের সাহচার্যে বেড়ে উঠেছিলেন। তাদের মধ্যে মাওলানা ভাসানীও ছিল অন্যতম। এটা ধ্রুব সত্যি যে, বাংলাদেশ যদি একটি মুদ্রার এপিঠ হয় তাহলে ওপিঠ হচ্ছে শেখ মুজিব। বঙ্গবন্ধু তার জীবনের সবটুকুই দেশের তরে বিলিয়ে দিয়ে গেছেন, তার ব্যক্তিগত প্রাপ্তির কোন মোহ ছিল না। তাই তো নির্বাচনে নিরঙ্কুশ জয়ের পর মীর জাফরের মত ক্ষমতা ভাগবাটোয়ারা না করে পাকিস্তানী হানাদারদের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি দিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য ডাক দিয়েছিলেন। তার সেই বিস্ময়কর ৭১ এর ৭ মার্চের ভাষণ। তিনি নিশ্চিত জানতেন ও বিশ্বাস করতেন যে, এটা তার ও বাঙালির জীবন-মরণ সন্ধিকাল। তাই সমস্ত জাতিকে এক কঠিন ও বাস্তব দিক-নির্দেশনা দিয়ে তিনি সমগ্র জাতিকে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় উদ্বুদ্ধ করে ছিলেন যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য। পশ্চিম পাকিস্তানের ২৩ বছরের বঞ্চনার ইতিহাস বর্ণনা করে স্বাধীনতার কবি দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।" এই ভাষণ প্রতিটি বাঙালিকে পরিণত করেছিল বীরের জাতিতে। সর্বস্তরের বাঙালিকে জয় বাংলার সৈনিকে রূপান্তরিত করেছিল।

নয় মাসের যুদ্ধে জয় বাংলা ছিল রণধ্বনি। মুজিব ছিলেন মহানায়ক আর ৭ মার্চের ভাষণ ছিল অনুপ্রেরণার উৎস।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মৃত্যুর অনেক আগেই এই দেশের মানুষের মুক্তির জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করে দিয়ে রেখেছিলেন। এ দেশের মানুষের জন্য মরতে তিনি সব সময়ই প্রস্তুত ছিলেন। ১৯৪৭ এ যখন ইংরেজরা চলে যাচ্ছে তার আগে শেখ মুজিব তার নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী আর শরৎচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে কিছুদিন স্বাধীন বৃহত্তর বাংলার জন্য আন্দোলন করেছিলেন। সেই আন্দোলন হালে পানি পায়নি। কলকাতার ইসলামিয়া কলেজের সিরাজউদ্দৌলা হোস্টেলে ছাত্রদের ডেকে তিনি বলেছিলেন, এই স্বাধীনতা স্বাধীনতা নয়, ঢাকায় যেতে হবে, প্রকৃত স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম শুরু করতে হবে।

১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দ থেকেই তিনি শুরু করেন সংগ্রাম। প্রথমে রাষ্ট্রভাষা বাংলার জন্য। সে বছরই তিনি ভাষা আন্দোলনে গ্রেফতার হন। তারপর কতবার কারাগারে গেছেন। বলতে গেলে জীবনের আসল সময়টুকুই তার কেটেছে কারাগারে বন্দী জীবন। কী ভীষণ প্রতিজ্ঞা, সাহস, একাগ্রতা, দেশপ্রেম, মানবপ্রেম আর আত্মত্যাগের বাসনা সেই তরুণ বয়স থেকেই ধারণ করতেন তিনি। আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হলে সারা দেশে কত পরিশ্রম করে সংগঠনের জন্য কাজ করেছেন। তখন ছিলেন তিনি পূর্ববাংলার সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা।

১৯৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকেই তিনি বারবার তার বক্তৃতায় পশ্চিম পাকিস্তানি শাসক আর মুসলিম লীগের অপশাসনের দুঃশাসনের বিরুদ্ধে কথা বলতেন, বলতেন বাংলার মানুষের মুক্তির কথা। এভাবে কতবার কারারুদ্ধ হয়ে এক কারাগার হতে আরেক কারাগারে জীবন কাটিয়েছেন। শেখ মুজিবের একটাই লক্ষ্য ছিল তা হলো এদেশের মানুষের মুক্তি। একটাই লক্ষ্য ছিল তা হলো বাংলার স্বাধীনতা। ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দের ৫ ডিসেম্বর শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যু দিবসে আলোচনা সভায় তিনি বলেছিলেন "আমি ঘোষণা করিতেছি- আজ হইতে পাকিস্তানি পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশটির নাম হইবে পূর্ব পাকিস্তানের বদলে শুধুমাত্র বাংলাদেশ"। ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে আইয়ুব খানের শাসন চলাকালে ত্রিপুরায় গিয়ে ভারত সরকাররের সঙ্গে করার চেষ্টা করেন। জানাতে চান যদি বাংলাদেশ ঘোষণা করে, তাহলে ভারত সরকার বাংলাদেশকে কতটা সাহায্য করতে পারবে। এভাবেই ছয় দফা দায়িত্ব আস্তে-আস্তে চূড়ান্ত স্বাধীনতার দিকে বাংলাদেশকে নিয়ে গিয়েছিল। [১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে জুন মাসে ঢাকার ভারপ্রাপ্ত মার্কিন কনসাল মি: কিলগোরকে বলেছিলেন "আমি স্বাধীনতা ঘোষণা করব। সেনাবাহিনী বাঁধা দিলে ঘোষণা করব গেরিলাযুদ্ধ]।

নিজের জীবনের মায়া তিনি কখনোই করেননি। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তানের কারাগারে যখন বন্দী, তখন ফাঁসিতে ঝোলানোর পরিকল্পনা হচ্ছিল। তার জেলের পাশে কবর খোঁড়া হয়েছিল। তখনও তিনি বলেছিলেন, মৃত্যুকে আমি ভয় পাই না, আমি বাঙালি, বাংলার মানুষের মুক্তির জন্য আমি জীবন দিতেও প্রস্তুত।

বীরের মৃত্যু নেই। বীর বেঁচে থাকে ইতিহাসের পাতায়, মানুষের হৃদয়ের মণিকোঠায়। বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকবেন যতদিন বাংলাদেশ থাকবে, যতদিন বাংলার মানুষ বেঁচে থাকবে॥

আদিবাসী তুমি আদিবাসীই থাকো

মানুয়েল চাম্বুগং

স্বাধীনতা অর্জনের চেয়ে স্বাধীনতা রক্ষা করা অনেক কঠিন। স্কুল জীবনে এই ভাবসম্প্রসারণটা না বুঝে মুখস্থ করেছিলাম। জীবনের কঠিন বাস্তবতায় এসে আজ এর মর্ম বুঝলাম। আসলে মানুষের জীবনে স্বাধীনতা রক্ষা করা বড়ই কঠিন। আমরা নিজেদেরকে আদিবাসী বলে দাবি করি ঠিকই কিন্তু একজন আদিবাসী হিসেবে আদিবাসী হয়ে থাকাটা যে আমাদের অধিকার, সেই অধিকারকে আমরা নিজেরাই রক্ষা করতে পারছি না। ছোটবেলা থেকে আজোবধি দেখছি অনেক আদিবাসী ছেলে-মেয়েদের যারা নিজ জাতি, ধর্ম ছেড়ে অন্য ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়ে যাচ্ছে। ইদানিং আমরা যদি একটু পর্যবেক্ষণ করি, তাহলে দেখবো আদিবাসীদের মধ্যে এমন কোন জাতি-গোষ্ঠি খোঁজে পাওয়া কঠিন হবে, যে জাতি-গোষ্ঠি থেকে কোনো ছেলে বা মেয়ে বিধর্মীদের কাছে চলে যাইনি। এক্ষেত্রে আরও একটি বিষয় লক্ষণীয় দিক হলো বিধর্মীদের হাত ধরে পালিয়ে যাওয়ার সংখ্যা ছেলেদের চেয়ে মেয়েদেরই বেশি। যা আমাদের আদিবাসীদের জন্য অশনি সংকেত। বিধর্মীদের কাছে চলে যাওয়ার সংখ্যা যদি দিনে-দিনে এভাবে বাড়তেই থাকে তাহলে ভবিষ্যতে আমাদের নিজস্ব জাতিসত্ত্বাকে ধরে রাখা কঠিন হয়ে পড়বে। বিশেষ করে মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা মান্দি ও খাসি আদিবাসীদের অস্তিত্ব ধরে রাখা ঝুঁকিপূর্ণ হবে। বিধর্মীদের বিয়ে করা আদিবাসী মেয়েদের জীবনের শেষ পরিণতি কি হয় আপনাদের সবারই কিছু না কিছু অভিজ্ঞতা আছে। এ জীবনে আমিও অনেক দেখেছি বিধর্মীদের কাছে চলে যাওয়া আদিবাসী মেয়েদের করুণ জীবন। নিম্নে দু'জন মেয়ের জীবনকাহিনী তুলে ধরলাম:

১. অনেক বছর আগে আমাদের গ্রামের বিউটি নামে একটি মেয়ে ঢাকা শহরে বিউটি পার্লারে কাজ করতে আসে। এক বছরের পর শুনলাম সে একজন মুসলিম ছেলের প্রলোভনে পড়ে এবং অনেকটা বাধ্য হয়ে সে তাকে বিয়ে করে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, বিয়ের এক বছর যেতে না যেতেই শুনতে পেলাম; মেয়ের জীবনের এক মর্মান্তিক ঘটনা। ঘটনাক্রমে জানলাম একদিন তাদের মধ্যে একটা বিষয় নিয়ে ঝগড়া হয়। ঝগড়ার এক পর্যায়ে বিউটিকে তার স্বামী গলা কেটে মেরে ফেলে এবং বিউটির এক আত্মীয় বড় ভাই লিটনকে ফাঁসায়। বিউটিকে হত্যা করে পুলিশ ও লিটনকে ফোন করে সে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। গলাকাটা লাশের পাশে কাউকে না পেয়ে পুলিশ লিটনকে থানায় নিয়ে যায়। লিটনকে নির্দোষ হয়েও একটানা ১৫ বছর জেল খাটতে হলো।

২. মোহম্মুদপুরে দিদির বাসার কাছেই একটি ফ্ল্যাটে তিন বান্ধবী থাকতো। তিন বান্ধবীর মধ্যে একজনের স্বামী হলো মুসলমান। তারা তিন বান্ধবীই একই পার্লারে কাজ করতো। দিদির মুখে শুনলাম। একদিন সেই আদিবাসী দু'টি মেয়ের শরীরে জ্বর থাকার কারণে অফিসে যায়নি। তাদের বান্ধবী একাই অফিসে যায়। বাসায় তার স্ত্রী না থাকায় মুসলিম ছেলেটি সুযোগ নেয়। বাইরে গিয়ে চিকিৎসার নামে একজন ডাক্তারকে নিয়ে আসে এবং দু'জনকে দু'টি ইনজেকশন দিয়ে মাথা থেকে কোমর পর্যন্ত অবশ করে ধর্ষণ করে সেখান থেকে পালিয়ে যায়। জ্ঞান ফিরে তাদের এই অবস্থা দেখে মেয়ে দু'টি হাউমাউ করে কাঁদতে থাকে। তাদের কান্না শুনে দিদি সেখানে যায় এবং ঘটনাটি শোনামাত্রই দিদি থানায় যেতে চাই সেই ধর্ষক নরপশুদের বিরুদ্ধে আইনের ব্যবস্থা নিতে। কিন্তু তারা কোনোমতেই রাজি হলো না; কেঁদে-কেঁদে বললো থানায় গিয়ে এখন আর কি হবে সবই তো শেষ হয়ে গেল। ঝামেলা করে লাভ নাই। বরং এখান থেকে চলে গেলেই আমাদের ভাল হয়।

হ্যাঁ সত্যিই আমাদের আদিবাসী মেয়েদের এই ধরণের করুণ জীবনকাহিনী শুনলে অনেক কষ্ট হয়। আপনাদের জীবন অভিজ্ঞতায় আপনারও হয়তো লক্ষ্য করেছেন, যে আদিবাসী মেয়েরা বিধর্মীদেরকে বিয়ে করেছে, দুই-একজন ছাড়া তারা বেশিরভাগই এধরনের স্বভাব চরিত্র মানুষের সাথে সংসার করে অশান্তিতে বসবাস করছে। আদিবাসী মেয়েরা কেন বা কি কারণে বিধর্মীদের কাছে চলে যায় এবং কি কি পদক্ষেপ নিলে এর সমাধান করা যেতে পারে সেগুলো নিম্নে দেওয়া হলো:

আদিবাসী মেয়েরা কেন বিধর্মীদের কাছে যায়

১. মেয়েদের উচ্চাকাঙ্ক্ষার জন্য।

২. মেয়েদের অর্থলোভের জন্য।

৩. ঢাকা শহরে মেয়েরা কিভাবে থাকে না থাকে পিতা-মাতাদের খোঁজ খবর না নেওয়ায়।

৪. পরিবারে মদ বিক্রির জন্য।

৫. বাজারে আদিবাসী মেয়েদের অবাধে বিচরণ।

৬. পারিবারিক আর্থিক অস্বচ্ছলতার জন্য।

৭. ফেসবুক, ইন্টারনেট ও মিডিয়ার প্রভাব।

৮. মেয়েদের আত্মসচেতনতার অভাব।

৯. ছেলেদের ভবঘুরে অলসতার কারণে।

১০. মেয়েদের অতিরিক্ত জেদের কারণে।

১১. মেয়েদের নিজস্ব জাতিস্বত্তাকে ভালাবাসায়।

১২. ছেলেদের মাত্রাতিরিক্ত মদ্যপানের জন্য।

১৩. পরিস্থিতির শিকারে।

১৪. মুসলিম স্কুল কলেজে একা একা পড়তে হয় বলে।

১৫. মেয়েদের অতি সরলতার ও নম্রতার জন্য।

সমাধানের কিছু উপায়সমূহ

১. নিজস্ব কৃষ্টি-সংস্কৃতি ও জাতিকে আদিবাসী মেয়েদের ভালবাসতে হবে।

২. ঢাকা শহরে কর্মরত মেয়েরা কি কাজ করে, কিভাবে থাকে প্রত্যেক পিতা-মাতাকে খোঁজ খবর নিতে হবে।

৩. পরিবারে মদ বিক্রি করা বন্ধ করতে হবে।

৪. ছেলেদের মাদক সেবন থেকে দূরে থাকা।

৫. সমাজ ব্যবস্থা আইনের কঠোর হওয়া।

৬. স্কুলে-কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া মেয়েরা কার সাথে মিশে, কোথায় যায় সেদিকে নজর দেওয়া।

৭. বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া মেয়েদেরকে বাজারে না নিয়ে যাওয়া।

৮. ধর্মীয় নেতাদের ছেলেমেয়েদের জন্য নৈতিক শিক্ষা প্রদান ও তাদের যত্ন নেওয়া।

(৬ পৃষ্ঠায় দেখুন)

“আমরা যেমন এক, তারাও যেন তেমনি এক হয়” *(যোহন ১৭:১১)*

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি’রোজারিও সিএসসি

গত ১ আগস্ট, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ “গ্লোবাল প্রেয়ার ফেলোশিপ” কর্তৃক আয়োজিত “গ্লোবাল প্রেয়ার ওয়ারিয়র কনফারেন্স (২) জুম কনফারেন্সে “আমরা যেমন এক, তারাও যেন তেমনি এক হয়” *(যোহন ১৭:১১)* বিষয়টির উপর মহামান্য কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি’রোজারিও সিএসসি বিশেষ বক্তব্য রাখেন। সকলের জন্য উপযোগী বিধায় তার বক্তব্যটি তুলে ধরা হলো।

১ ॥ ভূমিকা

“গ্লোবাল প্রেয়ার ফেলোশিপ” কর্তৃক, দ্বিতীয়বারের মতো অনলাইনে “গ্লোবাল প্রেয়ার ওয়ারিয়র কনফারেন্স” আয়োজনের জন্য আমি আমার নিজের পক্ষ থেকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। করোনাভাইরাসের বৈশ্বিক মহামারির সময়ে অনলাইনে এরূপ একটি প্রার্থনা আয়োজন যেমন যথোপযুক্ত, তেমনি “সামাজিক দূরত্ব”- থাকা সত্ত্বেও, প্রার্থনার মাধ্যমে খ্রিস্টবিশ্বাসীদের মধ্যে মিলন (কম্যুনিয়ন) বা ঐক্য সৃষ্টির একটা মহতী প্রচেষ্টা। তাছাড়া “তারা যেন এক হয়” –– যিশুর এই প্রার্থনার সঙ্গে একটা সামঞ্জস্য রেখে, তাঁর নির্দেশের প্রতি শিষ্যদের আনুগত্যের একটা সুন্দর অভিপ্রকাশও এ আয়োজনের মাধ্যমে ঘটছে।

আরও একটি কৃতজ্ঞতার বন্ধন অনুভব ক’রে, আমি এই প্রার্থনায় মিলিত হচ্ছি: “গ্লোবাল প্রেয়ার ওয়ারিয়র কনফারেন্স”-এর প্রথম প্রার্থনা-অনুষ্ঠানে, আমি যখন অসুস্থ ছিলাম, তখন আপনারা অনেকে আমার জন্য পরম করুণাময় প্রভুর কাছে প্রার্থনা নিবেদন করেছিলেন। আজ আমি সবার প্রার্থনার ফলে, প্রভুর সুস্থতা লাভ করেছি। আপনাদের সাথে এই প্রার্থনা-অনুষ্ঠানে মিলিত হয়ে পরম প্রভুর প্রশংসা করি এবং আপনাদের নিকটও আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। প্রভুর প্রশংসা হোক! তাঁর নামের মহিমা হোক!

২ ॥ শাস্ত্রপাঠ: যোহন ১৭:৯-১১

(দ্র: যোহন ১৭:১-২৬)

বাণীপ্রচারের শুরুতে আমরা প্রথমতঃ যিশুর নিজের প্রার্থনা যোহন লিখিত সুসমাচার থেকে শ্রবণ করি এবং তাঁর সঙ্গে একাত্ম হয়ে প্রার্থনা করি।

“আমি তাদের জন্য প্রার্থনা করছি; জগতের জন্য প্রার্থনা করছি না, কিন্তু যাদের তুমি আমাকে দিয়েছ, তাদেরই জন্য প্রার্থনা করছি; কারণ তারা তোমারই। যা কিছু আমার তা সমস্তই তোমার; এবং যা তোমার তা আমার, এবং এই ভাবেই আমি তাদের অন্তরে গৌরবান্বিত। আমি এজগতে আর থাকছি না, তারা কিন্তু এজগতে থাকছে, আর আমি তোমার কাছে আসছি। পবিত্রতম পিতা, তোমার যে নাম তুমি আমাকে দিয়েছ, সেই নামে তাদের রক্ষা কর: আমরা যেমন এক, তারাও যেন তেমনি এক হয়।” *(জুবিলী বাইবেল)*

বাইবেল পাঠ অনুসারে, এই উপস্থাপনার মূল বিষয় হচ্ছে: “তার যেন এক হয়”। এই আলোচনায় “এক হওয়া”, “মিলন”, “ঐক্য”, “একাত্মতা” শব্দগুলো প্রায় সমার্থক শব্দ হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

৩ ॥ শাস্ত্রবাক্যের কয়েকটি শব্দের ব্যাখ্যা:

আজকের সুসমাচারের পাঠ থেকে কয়েকটি শব্দ উল্লেখ করে মৌলিক কতিপয় বিষয়ের কিছু ব্যাখ্যা তুলে ধরছি।

নাম: ইহুদীরা পরমেশ্বরকে সদাপ্রভু বা ইয়াওয়ে নামে ডাকতেন। “নাম” বললে ব্যক্তিকেই বুঝায়। ইয়াওয়ে, “তিনি, যিনি আছেন”, তিনিই নিজেকে প্রকাশ করেন নবসন্ধিকালে, মানব যিশুর মাধ্যমে, যিনি হলেন ইম্মানুয়েল, মানুষের মাঝে যিনি আছেন।

পিতা: যিশু ইয়াওয়েকে “পিতা” বলে ডাকেন। পিতার সঙ্গে পুত্র হিসেবে যিশু সত্তাগতভাবে এক এবং সম্পর্কগতভাবেও তিনি এক। পিতা আছেন পুত্রের মধ্যে এবং পুত্র আছেন পিতার মধ্যে।

পবিত্র: পিতা ও পুত্রের মধ্যে “মিলন” বা “ঐক্যই” হল পবিত্রতা। পিতা ও পুত্র মিলে এক ও পবিত্র। এই পবিত্রতাই হচ্ছে খ্রিস্টবিশ্বাসী, অর্থাৎ যারা খ্রিস্টেতে অবগাহন পেয়ে ঈশ্বরের সন্তান হয়েছে তাদের জীবনের লক্ষ্য। পিতার সঙ্গে ও পুত্রের সঙ্গে এক হওয়াই পবিত্রতা। যিশুর শিষ্যদের জীবনের মূল বিষয় হচ্ছে পিতা ও পুত্রের সঙ্গে এক হওয়া। আর এভাবেই পবিত্র হওয়া।

মহিমা: যিশু পিতার নামের মহিমা প্রকাশ করেন, একইভাবে তাঁর শিষ্যরাও পিতা ও পুত্রের নাম ও তাঁদের মহিমা প্রকাশ করবে। পিতা ও পুত্রের সঙ্গে ‘এক হওয়াই’ জীবনের মহিমা।

৪ ॥ যিশুর যাজকীয় প্রার্থনা: মহিমা প্রকাশের প্রার্থনা

যোহন লিখিত সুসমাচারে বলা হয়েছে যে, যিশু আমাদের জন্য তাঁর পিতার কাছে প্রার্থনা করেন। এই প্রার্থনা তাঁর যাজকীয় প্রার্থনা। এই প্রার্থনার চারটি প্রধান অংশ আছে:

(ক) যিশু নিজ জীবনের মহিমা প্রার্থনা করেন: পিতার সাথে পুত্র হিসেবে এক হয়ে থাকাটাই তাঁর মহিমা। “এক হওয়া”র উদ্দেশে যিশু নিজের জীবনকে যজ্ঞ-বলি রূপে দান করেন; যিশু নিজেই যজ্ঞবেদী, যজ্ঞনৈবেদ্য ও যজ্ঞ-উৎসর্গকারী যাজক। আপন জীবনকে যজ্ঞদানের মধ্যদিয়ে যিশু পিতার মহিমা প্রকাশ করেছেন।

(খ) যাজকীয় প্রার্থনায় যিশু শিষ্যদের মহিমার জন্য প্রার্থনা করেন: যেমন যিশু বলেন: “তারা তোমারই” (৯), “আমরা যেমন এক তারা যেন এক হয়” (১১), “মন্দ আত্মা হতে তাদের রক্ষা কর” (১৫), “তাদের পবিত্রীকৃত কর” (২৩)।

(গ) যিশু সকল বিশ্বাসীদের মহিমা প্রার্থনা করেন: তারা যেন এক হয়; যেন জগৎ জানতে পারে যে, তুমি আমাকে প্রেরণ করেছ (২৩)।

(ঘ) যিশু প্রার্থনা করেন যেন, শিষ্যেরা তাঁর সাথে এক হয়ে থাকে ও তাঁর মহিমা দর্শন করে (২৪-২৬)। সবার সাথে এক হয়ে থাকা এবং সেই এক হওয়ার মহিমা দেখতে পারাই অনন্তকালীন সুখ।

সংক্ষিপ্ত অকারে বলা যায় যে, খ্রিস্টীয় “মিলন” বা “এক হওয়া” হচ্ছে মূলতঃ ও প্রথমতঃ শিষ্যদের খ্রিস্টকেন্দ্রিক জীবন। “এক হওয়া” হচ্ছে খ্রিস্টীয় আধ্যাত্মিকতা, যাকে মিলনের আধ্যাত্মিকতা বলা চলে।

৫ ॥ বর্তমান বিশ্বায়ন যুগে “এক হওয়া” বা “মিলন”–এর লক্ষণ: (দ্র: “বিশপ থিয়োটনিয়াস গমেজ সিএসসি, “তারা যেন এক হয়”, বক্তব্য, ২০১৫)

(১) এক হওয়ার জন্য বহির্মুখী যাত্রা: মানুষে-মানুষে, জাতিতে-জাতিতে, জ্ঞান-বিজ্ঞানে, ব্যবসা-বাণিজ্যে, কৃষ্টি ও ধর্মে,

সমাজ ও রাজনীতিতে; সর্বত্র বহির্মুখী আনাগোনা ও চলাচল।

(২) এক হওয়ার জন্য অন্তর্মুখী যাত্রা: জাগতিকের মধ্যে আত্মিক, বাহ্যিকতার মধ্যে অন্তরের দিকে যাত্রা; বৃহত্তর থেকে ক্ষুদ্রে যাত্রা, বাইরে থেকে ভেতরে যাত্রা, বিজ্ঞানে অণু-পরমাণু আবিষ্কারের জন্য যাত্রা; এই ধারার মধ্যে ধর্মও কিন্তু সবকিছুর হৃদয় বা অন্তর অনুসন্ধান করার কাজে রত থাকে।

(৩) এক হওয়ার জন্য আন্তঃসম্পর্কের দিকে যাত্রা: সংলাপ, একাত্মতা, সামাজিক সম্পর্ক ও যোগাযোগ, পারস্পরিকতার মনোভাব, ইত্যাদি।

(৪) এক হওয়ার জন্য তৃণমূলে যাত্রা:

⇨ গণতান্ত্রিক/গণমাত্রিক/গণমানুষের প্রতি মনোযোগ ও মন-মানসিকতার দিকে যাত্রা;

⇨ দরিদ্রদের দিকে যাত্রা: বিগত শতবর্ষে পাঁচটি ধাপে এই যাত্রাটি চলছে:

(ক) দরিদ্রদের আর্থিক উন্নয়ন, **(খ)** দরিদ্রদের মানবব্যক্তির উন্নয়ন (সমন্বিত), **(গ)** উন্নয়নের কর্তা দরিদ্ররা নিজে, **(ঘ)** দরিদ্রদের সাথে একাত্মতা, **(ঙ)** দরিদ্রদের জীবন গ্রহণ।

⇨ প্রকৃতি ও পরিবেশের দিকে যাত্রা: যান্ত্রিক প্রযুক্তি থেকে সৃষ্টিতে নিহিত সহজ-সরল প্রযুক্তির প্রতি মনোযোগ।

(৫) বিশ্বায়নের যুগে এক হওয়ার যাত্রায় দুটো নেতিবাচক অভিজ্ঞতা:

⇨ ব্যক্তির স্বকীয়তা লঙ্ঘন, ছোট বা ক্ষুদ্রের স্বকীয়তা ও মর্যাদা বিনষ্ট হচ্ছে (অমানবিকতা/ব্যক্তির মর্যাদা ও অধিকার)

⇨ সামাজিকতা লঙ্ঘন; এককভাবে চাপিয়ে দেওয়ার প্রবণতা (পারস্পরিকতার অভাব)

(৬) এক হওয়ার যাত্রায় ধর্মের করণীয়:

উপরোক্ত "এক হওয়া" বা "মিলন"-এর যাত্রা ও ধারাসমূহে ধর্ম যদি বিরোধিতা করে তা হলে কঠিন আকার ধারণ করবে; অতীত মানব-ইতিহাস তার সাক্ষী (যুদ্ধ, সংঘাত, সহিংসতা, ধর্মান্ধতা, জঙ্গীবাদ, ইত্যাদি। আর অপরদিকে ধর্ম যদি এক হওয়ার ও মিলনের পক্ষে থাকে, উদ্বুদ্ধ করে ও প্রেরণা যোগায়, তাহলে ধর্ম গোটা মানবজাতিকে মিলন-সমাজ হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়তা দান করতে পারে।

সুতারাং বর্তমান বিশ্বায়ন যুগে এক হওয়া বা মিলনের জন্য খ্রিস্টমণ্ডলীর যাত্রা হবে খ্রিস্টকেন্দ্রিক ও খ্রিস্টনির্দেশিত যাত্রা: "তারা যেন এক হয়"। খ্রিস্টমণ্ডলীর ঐক্য প্রচেষ্টার জন্যও প্রথমতঃ তৃণমূল থেকে শুরু করতে হবে, যেখানে থাকবে: খ্রিস্টকেন্দ্রিক ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক, সামাজিক, মাণ্ডলিক এবং অভ্যন্তরীণ জীবন সাধনা এবং খ্রিস্টীয় সাংগঠনিক অবকাঠামো ও বাণীপ্রচার।

৬ ॥ খ্রিস্টবিশ্বাসীদের জন্য "এক হওয়ার" অর্থ কী

"তারা যেন এক হয়" যিশুর এই প্রার্থনা হচ্ছে খ্রিস্টবিশ্বাসীদের প্রধান মিশন। জগতের জন্য ঐশ-পরিকল্পনা ও ঐশ-অনুগ্রহের ডাকে সাড়া দিয়ে আমরা খ্রিস্ট-নির্দেশিত মিলনের পথ ধরে চলছি, যেন একদিন যিশুর প্রার্থনা আমাদের মধ্যে সত্য হয়ে ওঠে। মণ্ডলী হচ্ছে কৈনোনিয়া/কম্যুনিয়ন অথবা মিলন-সমাজ। বাস্তবতায় মণ্ডলী তাঁর খ্রিস্টবিশ্বাস, সংস্কারীয় জীবন ও যাজকীয় সেবাকাজের বন্ধনে অবস্থান ক'রে পূর্ণ কৈনোনিয়া/কম্যুনিয়নের উদ্দেশে যাত্রা করছে, যা হচ্ছে খ্রিস্টীয় ঐক্য প্রচেষ্টার প্রধান লক্ষ্য।

খ্রিস্টমণ্ডলী যে কৈনোনিয়া বা কম্যুনিয়ন তার গভীর ভিত্তিমূল হচ্ছে পবিত্র ত্রিত্ব: পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার মধ্যে ঐক্য বা মিলন। মানুষের ভুল-ভ্রান্তি ও দোষ-অপরাধের ফলে মণ্ডলীতে এসেছে বিচ্ছিন্নতা। তবে সব মণ্ডলী বা মাণ্ডলিক সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে সত্যের সহভাগিতাও রয়েছে। খ্রিস্টযিশুর আত্মা সেই সত্যকে পরিত্রাণের সহায়ক হিসেবে ব্যবহার করে থাকেন।

তথাপি খ্রিস্টীয় ঐক্য বা মিলনের যে ধরনগুলো বর্তমানে আমাদের আছে তাতে কোন খ্রিস্টভক্তই পূর্ণভাবে তৃপ্ত থাকতে পারে না। ঈশ্বরের অনুগ্রহ সকল মণ্ডলী ও মাণ্ডলিক সম্প্রদায়সমূহকে উদ্বুদ্ধ করছে যেন যে বিচ্ছিন্নতা আমরা অতীত থেকে লাভ করেছি তা যেন আমরা জয় করি এবং নতুন মিলন ও ঐক্য গড়ে তুলি। এই মিলন আসবে অনুতাপের মধ্য দিয়ে, অতীত ও বর্তমান অনৈক্যের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে এবং ঐশতাত্ত্বিক সংলাপ ও পারস্পরিক সহযোগিতার জন্য বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করার মধ্যদিয়ে।

৭ ॥ বর্তমান মহামারি দুর্যোগকালে "এক হওয়ার" জন্য প্রার্থনা

যিশুর প্রার্থনা "তারা যেন এক হয়" –এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে বিভিন্ন খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে ইতিমধ্যে চলমান অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে বা ভবিষ্যতে অনেক সম্ভাব্য ক্ষেত্রও উন্মুক্ত আছে। এ বিষয়ে বিশদ আলোচনার করার সুযোগ এখানে নেই। তবে বর্তমান পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে আমাদের এই প্রার্থনা-অনুষ্ঠান যিশুর প্রার্থনারই প্রতিফলন। এই বিষয়ে কয়েকটি ধ্যান আপনাদের সাথে সহভাগিতা করছি।

বিগত আটমাস ধরে করোনাভাইরাসের বৈশ্বিক মহামারিকালে, ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, দেশ ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আমরা যা উপলব্ধি করছি সেই বাস্তবতাকে একটি শব্দ দিয়ে প্রকাশ করা যেতে পারে, আর তা হল: "মিলন" বা "কম্যুনিয়ন", যার অর্থ হচ্ছে "এক হওয়া" বা যিশুর প্রার্থনায় যেমন আছে: "তারা যেন এক হয়"। বর্তমান বাস্তবতার মধ্যে মিলন বা এক হওয়ার ধারায় নেতিবাচক ও ইতিবাচক উভয় অভিজ্ঞতাই আমাদের আছে, অর্থাৎ একদিকে আছে মিলনের শুভ চিহ্ন বা নিদর্শন, আবার অন্যদিকে আছে মিলনের অভাব।

(ক) মিলন বা "এক হওয়ার" ত্রিমাত্রিক সমন্বিত ধারা:

মিলন অথবা এক হওয়ার মধ্যে আছে ত্রিমাত্রিক ধারা: **(১)** ঈশ্বরের সাথে এক হওয়া; **(২)** মানুষের সাথে এক হওয়া; **(৩)** প্রকৃতি ও পরিবেশের সাথে এক হওয়া। এই তিনটির মধ্যে নিহিত রয়েছে মিলন বা এক হওয়ার অন্য সকল দিক:

(১) ঈশ্বরের সাথে এক হওয়া : এর মধ্যে আছে মানুষের প্রতি ঈশ্বরের ভালবাসা উপলব্ধি এবং ঈশ্বরের প্রতি মানুষের ভালবাসা যা প্রকাশ পায়: ঐশবাণী, প্রার্থনা ও উপবাস; মিলন, একাত্মতা ও বিশ্বস্ততা; উপাসনা, কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসা; দয়া, ক্ষমা ও সুস্থতা, আত্মিক মুক্তি ও পরিত্রাণ, ইত্যাদির মাধ্যমে।

(২) মানুষের সাথে এক হওয়া : মানুষের প্রতি, বিশেষভাবে দীনজনদের প্রতি, মানুষের একাত্মতা; এর ফলে আসে মানবিক সম্পর্ক, ন্যায্যতা ও ভ্রাতৃত্ব; মিলন, একাত্মতা ও শান্তি; ক্ষমা, দয়া ও সাহায্য-সহযোগিতা; মমতা, বিনম্রতা ও সেবা, ইত্যাদি।

(৩) প্রকৃতি ও পরিবেশের সাথে এক হওয়া: জগৎ ও প্রকৃতির সাথে এক হতে হলে প্রথমেই স্বীকার করে নিতে হবে যে, সবকিছু ঈশ্বরের সৃষ্টি, আর তিনি হচ্ছেন সৃষ্টিকর্তা। জগৎ সৃষ্টি ও প্রকৃতিগত পরিবেশের সাথে একাত্মতা স্বীকার করার অর্থ হচ্ছে: মানুষ আমরা, প্রকৃত মালিক নই, বরং কর্মচারী। ঈশ্বরের বিশ্বস্ত কর্মচারী হয়ে সৃষ্টিকে ভালবাসা, তার যত্ন নেওয়া ও তার সুরক্ষা করা আমাদের দায়িত্ব; সকল প্রকার

অপব্যবহার, অপচয় ও দূষণ থেকে প্রকৃতি ও পরিবেশকে রক্ষা করা আমাদের কর্তব্য, ইত্যাদি।

বর্তমান করোনাভাইরাসে আক্রান্ত বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে, আজকের এই বৈশ্বিক প্রার্থনা-অনুষ্ঠানে আমাদের প্রার্থনা হচ্ছে: আমরা যেন পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার সঙ্গে এক হতে পারি; আমরা যেন সকল মানুষের সঙ্গে, বিশেষভাবে দীন ভাইবোনদের সঙ্গে এক হতে পারি; এবং সর্বসাধারণের বসতবাড়ি আমাদের এই ধরিত্রীর সকল সৃষ্টির সঙ্গে এক হতে পারি।

(খ) বর্তমান দুর্যোগে আমাদের জন্য যিশুর প্রার্থনা

বর্তমান বৈশ্বিক দুর্যোগকালে, বিভিন্ন মণ্ডলী থেকে এসে শুধু আমরাই একত্র হয়ে প্রার্থনা করছি তা নয়, বরং যিশু আমাদের সঙ্গে এক হয়ে আমাদের জন্য প্রার্থনা করছেন। এটা বড় আনন্দময় উপলব্ধি, এই আনন্দ সুসমাচারের আনন্দ। যিশুই আমাদেরকে এক করেন, তিনিই আবার আমাদের জন্য প্রার্থনা করছেন। প্রার্থনা করছেন যেন বর্তমানের বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন পরিস্থিতিতে, সব মানুষ, সমাজ ও জাতি একত্রিত হয়ে, মানুষের আর্তনাদ, চিৎকার ও আবেদন পিতার কাছে তুলে ধরে; এবং সম্মিলিত কণ্ঠে, সবাই এক হয়ে, মিলন ও এক হওয়ার জন্য প্রার্থনা করে। আমরা বারংবার শুনি আমাদের জন্য পিতার কাছে যিশুর আকুল প্রার্থনা: "তারা যেন এক হয়"।

(গ) করোনায় আক্রান্ত ও অসুস্থদের সঙ্গে একাত্মতা।

যে-পৃথিবীতে আমরা বাস করছি সেই পৃথিবী নানাভাবে অসুস্থ। পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ অসুস্থতায় ভুগছে। এই পৃথিবীর যত্ন নিতে, অসুস্থ মানুষের স্বাস্থ্যসেবা দিতে মানুষ অক্ষম, অপারগ ও অসমর্থ। অথচ যুদ্ধ করতে, যুদ্ধাস্ত্র উৎপাদন করতে, সহিংসাত্মক কার্যক্রম চালিয়ে যেতে মানুষ খুবই সম্পদশালী ও দক্ষ। প্রকৃতি ও পরিবেশ কতভাবে আক্রান্ত হচ্ছে, কত মানুষ সংক্রমিত হচ্ছে ও কত মানুষ প্রাণ হারাচ্ছে প্রতিদিন। অসুস্থ পৃথিবী ও অসুস্থ মানুষের সঙ্গে এক হয়ে আমরা প্রার্থনা করছি। আমরা অসমর্থ, কিন্তু আমরা প্রার্থনা করছি যেন যিশু আমাদের জন্য পিতার কাছে তাঁর যাজকীয় প্রার্থনা উচ্চারণ করেন।

(ঘ) প্রত্যাশায় এক হওয়া:

সাম্প্রতিক করোনা-আক্রান্ত দুর্যোগকালে "এক হওয়া" বা "মিলন"-এর নিদর্শন ও তার অভাব যেমন লক্ষ্যণীয়, ঠিক তেমনি আরেকটি নিদর্শনও সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্যণীয়, আর তা হল "প্রত্যাশা"। দুর্যোগের এই কঠিন মুহূর্তে অনেক ভালোর সন্ধান মিলছে যা মানুষকে প্রত্যাশী ক'রে তুলছে। এখানে সকল ধর্ম, বিশেষভাবে খ্রিস্টধর্ম ইতিবাচক দিকগুলো সংগ্রহ করছে এবং ভবিষ্যতে "মিলনের" পথ চিহ্নিত করে মানুষকে আশান্বিত এবং উদ্বুদ্ধ করছে। অতএব খ্রিস্টবিশ্বাসী আমরা, সুসমাচারজনিত প্রত্যাশার পথ ধরে "এক হওয়ার" যাত্রায় ভবিষ্যতেও নিবিষ্ট থাকব।

৮ ॥ সমাপণ প্রার্থনা:

হে প্রভু যিশু, বর্তমান বিশ্বায়ন জগতে যখন দেখা যাচ্ছে মিলন ও এক হওয়ার একাধিক ধারা, ঠিক সেই মুহূর্তে তুমি তোমার বিশ্বাসী শিষ্যদের জন্য পিতার কাছে প্রার্থনা করে বলছ: "তারা যেন এক হয়"।

সুসমাচারে আজ তোমার প্রার্থনা ও বাণী আমরা শ্রবণ ও ধ্যান করেছি। বর্তমানকালে তুমি চাও যেন আমরা আমাদের ধর্মবিশ্বাস নিয়ে, এক হয়ে ও মিলনের পক্ষে কাজ করে, গোটা মানবজাতিকে মিলন-সমাজ হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়তা করি।

প্রভু যিশু, তোমাতে অবগাহিত হয়ে আমরা, বিভিন্ন মণ্ডলীর সবাই, তোমার পিতার সন্তান হয়েছি। অবগাহন বা দীক্ষাস্নান দ্বারা, আমাদের মধ্যে যে ঐক্য দিয়েছ তা যেন বিশ্বাসে, সম্পর্কে ও সেবাকাজে দৃশ্যমান করে তুলতে পারি এবং পূর্ণভাবে এক হওয়ার লক্ষ্যে পবিত্র আত্মার সহায়তায় পথ চলতে পারি।

প্রভু যিশু, বিনম্রতার সাথে স্বীকার করি যে, আমাদের মধ্যে মিলন ও একতার অনেক ঘাটতি আছে। আমাদের মধ্যে থাকা বিচ্ছিন্নতার কারণ যদি আমরা হয়ে থাকি, তার জন্য অনুতপ্ত অন্তরে ক্ষমা চাই। ক্ষমা দিয়ে আমাদের পুনর্মিলিত কর। আমাদের নম্রতা দিয়ে তুমি অন্যের সঙ্গে আমাদের এক কর।

প্রার্থনা করি প্রভু, আমরা যেন তোমার সঙ্গে এবং তোমার পিতা ও আত্মার সঙ্গে এক হয়ে বাস করতে পারি; আমরা যেন সকল মানুষের সঙ্গে, বিশেষভাবে দীন ভাইবোনদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে জীবন-যাপন করতে পারি; এবং সর্বসাধারণের বসতবাড়ি আমাদের এই প্রিয় ধরিত্রীর সকল সৃষ্টির প্রতি ভালবাসা ও যত্ন দিয়ে সুরক্ষা করতে নিষ্ঠাবান হতে পারি।

বর্তমান মহামারিতে যারা আক্রান্ত হয়েছেন তাদের সঙ্গে এক হয়ে, তাদের জন্য তোমার সুস্থতা কামনা করি। সকল বিচ্ছিন্নতা ও বিভিন্নতার মধ্যে তোমাকে ভিত্তি ও কেন্দ্র করে আমরা যেন এক হয়ে মিলন সমাজরূপ মণ্ডলী গড়ে তুলতে পারি। প্রার্থনায় যেন আমরা এক থাকতে পারি। তোমারই নামের গুণে এই প্রার্থনা করি।

-আমেন।

পরিসমাপ্তিতে আমি বলতে চাই যে: আমাদের প্রার্থনা হোক যিশুর প্রার্থনা; আমাদের প্রার্থনা হোক আগামী দিনের মিশন; আমাদের প্রার্থনা হোক "এক হওয়ার" প্রত্যাশা।

"প্রভু যিশু খ্রিস্টের অনুগ্রহ, পিতা ঈশ্বরের প্রেম এবং পবিত্রতার একাত্মতা আপনাদের মধ্যে বিরাজ করুক।" আমেন।

দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা
তেজগাঁও, ডাকঘর ও উপজেলা: তেজগাঁও, জেলা : ঢাকা।
তারিখ: ২৭ জুলাই, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

হিসাবের সত্যতা নিশ্চিতকরণের সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা উপরোক্ত ক্রেডিট ইউনিয়নের সম্মানিত সকল সদস্য/সদস্যা, দেনাদার ও পাওনাদারগণের অবগতি ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে জানানো যাচ্ছে যে, উক্ত ক্রেডিট ইউনিয়নের ২০১৯-২০২০ আর্থিক বছরের বিধিবদ্ধ বার্ষিক নিরীক্ষা (বকেয়াসহ যদি থাকে) আগামী ১২/০৮/২০২০ খ্রিস্টাব্দ তারিখ হতে ক্রেডিট ইউনিয়নের নিবন্ধিত কার্যালয়ে আরম্ভ করা হবে। সে মতে সংশ্লিষ্ট সকলকে তাদের নামীয় নিজ নিজ হিসাবাদি ক্রেডিট ইউনিয়নে রক্ষিত হিসাবের সাথে নিরীক্ষা চলাকালীন সময়ে মিলিয়ে নেয়ার জন্যে অনুরোধ করা হলো। উল্লেখ্য, এ ব্যাপারে আলাদা কোনো ভেরিফিকেশন স্লীপ ইস্যু করা হবে না এবং হিসাবাদি মিলিয়ে না নিলে ক্রেডিট ইউনিয়নে রক্ষিত হিসাবকে চূড়ান্ত বিবেচনা করে বিধিবদ্ধ বার্ষিক নিরীক্ষা সম্পন্ন করা হবে।

উৎপল কুমার অধিকারী
সিনিয়র অফিসার, অডিট, কাল্‌ব
ও দলনেতা, অডিট দল
দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ও আদিবাসী জনগণের প্রত্যাশা

থিওফিল নকরেক

পটভূমি: দেশে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শততম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন করা হচ্ছে। রাষ্ট্রীয়ভাবে এবং নানা সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠনের মাধ্যমে এই মহান নেতার জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হচ্ছে। সরকারীভাবে মহান নেতার শততম জন্মবার্ষিকী যে মাত্রায় উদ্‌যাপন করার প্রস্তুতি হচ্ছিল তা মহামারি করোনাভাইরাসের কারণে সংকোচিত করা হয়। বিভিন্ন রাষ্ট্র প্রধান ও সরকার প্রধান উপস্থিত থাকার কথা থাকলেও জনগণের স্বাস্থ্যঝুঁকি চিন্তা করে শেষ মুহূর্তে বাতিল করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এই বিজ্ঞতাপ্রসূত সিদ্ধান্তকে সকলেই সাধুবাদ জানিয়েছেন। আমিও মনে করি দেশের মহামারি পরিস্থিতিতে এই সিদ্ধান্ত ছাড়া কোনো বিকল্প ছিল না। কিন্তু মানুষের মনে বঙ্গবন্ধুর চেতনাকে প্রকাশ ও তাকে যথাযথ সম্মান জানানো কোনোভাবে কমতি দেখা যায়নি। বিভিন্ন অনলাইন মিডিয়া ও প্রচার মাধ্যম, সামাজিক মাধ্যম সর্বদা সরব দেখা গেছে মহান নেতার শততম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপনে। আমার এই লেখা জন্মবার্ষিকী নিয়ে নয়। আমি মূলত আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ওপর বঙ্গবন্ধুর চেতনা ও প্রভাব তুলে ধরার প্রয়াস নিয়েছি। আমার যতটুকু জ্ঞান সেটা নিয়েই এই মহান নেতার বিষয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তুলে ধরতে চাই।

বনবাসী আদিবাসীদের প্রতি বঙ্গবন্ধুর সহমর্মিতা: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ১৮ জানুয়ারি মধুপুর বনের দোখলা বনবিভাগের রেস্ট হাউজে অবকাশ যাপনে যান সস্ত্রীক। তিনি সেখানে কয়েকদিন অবস্থান করেন। সেখানে তিনি রেস্ট হাউজের সামনে একটি আম গাছের চারা রোপণ করেন যা এখনো ইতিহাসের সাক্ষী হিসেবে বিদ্যমান। কালের কণ্ঠের প্রকাশিত তথ্য থেকে জানা যায় যে ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনের পর বঙ্গবন্ধু ক্লান্ত হয়ে পড়েন। এছাড়া অনেক দুঃসহ কারাবাসের পর মানসিক ক্লান্তি আসে। তিনি সেই ক্লান্তি দূর করতেই মূলত সেখানে গিয়েছিলেন। তবে তিনি সেখানে একা যাননি। তার সফর সঙ্গী ছিলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমেদ ও বিশিষ্ট আইনজীবি ড. কামাল হোসেন। সফরকালে তিনি বাংলাদেশের সংবিধানের প্রাথমিক খসড়া তৈরির কাজ করেন। তার এই সফরে তিনি গারো আদিবাসী গ্রাম চুনিয়াতে বেড়াতে যান এবং তৎকালীন গারোদের নেতা আবিমা রাজা বলে খ্যাত মি: পরেশ চন্দ্র মৃ এর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। গারো আদিবাসীদের পক্ষে তখন বিভিন্ন সমস্যার কথা আবিমা রাজা পরেশ চন্দ্র মৃ বঙ্গবন্ধুর কাছে তুলে ধরেন। গারোদের সমস্যা শুনে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন যে, 'মধুপুরে জাতীয় উদ্যানও থাকবে এবং এখানকার আদিবাসীরাও থাকবে। তাদের কোথাও উচ্ছেদ করা হবে না।' বঙ্গবন্ধুর ঐ সফরের কথা এখনো এলাকাবাসী স্মরণ করেন। জনিক নকরেক স্মৃতিচারণ করে বলেন, 'শেখ সাহেব আমাদের অনেক ভালোবাসতেন। তিনি আমাদের কথা অনেক চিন্তা করতেন।' মধুপুরের গারো আদিবাসীরা আজো সেই স্মৃতি বহন করে বর্তমান সরকারের একনিষ্ঠ অনুসারী হয়ে আছে। বঙ্গবন্ধুর আশ্বাসবাণীতে তারা বুকভরা আশা নিয়ে এখনো বেঁচে আছে। তাদের ভূমির অধিকারসহ নানা উন্নয়নমুখী কার্যক্রম বর্তমান সরকারের পরিকল্পনায় রয়েছে এবং বাস্তবায়ন চলছে। তাদের প্রত্যাশা এলাকার গারোদের ভূমি সমস্যা এই সরকারের সময়েই সমাধান করা সম্ভব।

রাজনৈতিক মতাদর্শ: বঙ্গবন্ধুর দর্শন ছিল মানুষকে ভালোবাসা। তাইতো তিনি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন। বিভিন্ন ইসলামিক দেশ থেকে নানা চাপ আসলেও তিনি পিছ পা হননি। লিবিয়ার গাদ্দাফী বন্ধুরাষ্ট্র হওয়ার শর্ত হিসেবে 'ইসলামিক রিপাবলিক অব বাংলাদেশ' হিসেবে নামকরণ করতে বলেছিলেন। তিনি সেখানে বলেছেন যে মুক্তিযুদ্ধে মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান সবাই মিলে ঝাঁপিয়ে পড়েছি। সুতরাং এই দেশ সবার। সৌদি আরব 'ইসলামিক রিপাবলিকান অব বাংলাদেশ' নামকরণ করলে সহায়তার আশ্বাস দিলে তিনি সেটাও প্রত্যাখান করে বলেন যে 'আপনার দেশও তো 'ইসলামিক রিপাবলিক অব সৌদি আরব' করেননি।' দেশের স্বার্থবিরোধী কোনো সিদ্ধান্তে কোনো চাপের কাছে মাথা নত করেননি তিনি। রাজনৈতিক আদর্শ ও মানুষের ভালোবাসা তিনি কখনো ভুলে যাননি।

বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে মুক্তিযুদ্ধে আদিবাসীরা: বঙ্গবন্ধু এমন একটি নাম যার ডাকে বিনাবাক্যে আদিবাসীরাও যুদ্ধে নেমে পড়ে। হাজার-হাজার গারো আদিবাসী স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তাদের অনেকে শহীদ হয়েছেন। দেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে অনেকে স্বীকৃতিও পেয়েছেন। তখন কেউ প্রশ্ন করেননি যে যুদ্ধ করে আমাদের কি লাভ হবে? তারা মুক্তিযুদ্ধ করেছেন দেশকে স্বাধীন করতে। স্বাধীনতা পরবর্তীতে অনেকে রাষ্ট্রীয় নানা সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করেছেন এবং এখনো মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে ভাতা গ্রহণ করেন। ১৯৭৫ পরবর্তী ঘটনা অনেকেরই জানা যে বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকীর সাথে একমাত্র গারোরা বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রতিবাদে স্বশস্ত্র সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেন। গারো এলাকায় এর ফলে তৎকালীন সরকারের নানা অত্যাচার ও নিপীড়ন নেমে আসে।

দেশের মহান সংবিধান: সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীতে বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কথা সংযোজন করা হয়েছে। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের সংবিধানে দেশের আদিবাসীদের অন্তর্ভূক্ত করার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামের তৎকালীন সাংসদ দাবী জানিয়েছিলেন। কিন্তু তখন সেখানে উপেক্ষিত হয়। বাংলাদেশের সংবিধানে তিন সংসদ সদস্য স্বাক্ষর করেননি। জননেতা মানবেন্দ্র লারমা, এমপি প্রতিবাদে সংসদ থেকে ওয়াকআউট করেন। পরবর্তীকালে বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেটা পূরণ করার জন্য বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আইন পাশ করেন তার মধ্যে ক) ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী কালচারাল একাডেমি উন্নয়ন। ও খ) সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী। সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীতে সংবিধানের ২৩(ক) অনুচ্ছেদ সংযোজন করে বাংলাদেশে আদিবাসীদের 'ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী' হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।

পরিশেষে বলতে পারি যে, বঙ্গবন্ধুর জীবন ও আদর্শ আদিবাসীদের মাঝে প্রভাবিত করেছে। তার আহ্বানে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে দেশকে স্বাধীন করেছে। তাঁর আদর্শে গড়া রাজনীতি দলে আদিবাসীরা যুক্ত হয়েছেন ও সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন, মন্ত্রীও হয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধে যেমন অংশগ্রহণ করেছেন তেমনি বর্তমানে নানা উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে অবদান রেখে যাচ্ছেন। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় এই আদিবাসীরা তাদের জীবনমান উন্নয়নে বড় অবদান রাখবে বলে আমার প্রত্যাশা। বঙ্গবন্ধুর শততম জন্মবার্ষিকীতে তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর স্বপ্ন 'সোনার বাংলা' হিসেবে দেশ গড়ার অঙ্গীকার করি।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. *নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধু, সম্পাদনা, রাজীব পাভেজ, শাবণী প্রকাশনী, ২০১৫, ঢাকা।*
২. *বঙ্গবন্ধু, সম্পাদনা, ডঃ মিজান রহমান, ভাষা প্রকাশ, ২০০৮, ঢাকা*

তথ্যসূত্রঃ

https://www.kalerkantho.com/print-edition/news/2017/03/21/477105
https://www.parbattanews.com/
https://www.ajkertangail.com/

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও আমার স্মৃতির ভান্ডার

ডাঃ নেভেল ডি রোজারিও

বাংলাদেশের স্থপতি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করছি আমার এ মহান নেতার সাথে অনেক স্মৃতির এক দুর্লভ মুহূর্তের স্মৃতি হাতড়িয়ে। চুয়াত্তরের জানুয়ারীতে ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন শেষে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নেতাদের সাথে নিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানাতে গণভবনে যাই। বঙ্গবন্ধু সাধারণত তাঁর সকল নেতা-কর্মীদের তাঁর স্বভাবসুলভ ভঙ্গীতে আদর করে 'তুই' করে বলতেন। আমাকে পরিচয় করাকালীন নাম শুনেই বলে উঠলেন, "কি রে বাড়ি কই? কলাকোপা-বান্দুরায়?" যখন বললাম 'না, কালীগঞ্জে'। সাথে-সাথে বলে উঠলেন, "নাগরীতে?" বললাম 'তুমিলিয়া'। পাল্টা প্রশ্ন করলেন, "ময়েজউদ্দীনের বাড়ির কত দূরে?" বললাম 'কাছেই'। কলাকোপা-বান্দুরা-নাগরী-তুমিলিয়া খ্রিস্টান জনবসতি সম্পর্কে বঙ্গবন্ধুর ব্যাপক ধারণা দেখে সাহস করে জিজ্ঞেস করে ফেললাম, 'লিডার, আমাদের হলি ফ্যামিলি হাসপাতালটা নিয়ে নিলেন ক্যান?' বঙ্গবন্ধু কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, "আমি কি তোগো হাসপাতাল নিসি না সিস্টাররা দিল্লীতে International Red Cross-রে হস্তান্তর করছে আফ্রিকার কোনো দেশে হাসপাতাল নির্মাণের স্থানের বিনিময়ে?"

Sisters of Holy Family সম্প্রদায়ের সিস্টারগণ ঢাকার হলি ফ্যামিলী হাসপাতালটি মূলতঃ সম্প্রদায়ের আর্থিক সাবসিডি ও অনুদানে চালাতেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার আগে থেকেই সিস্টারগণ হাসপাতালটি হস্তান্তরের চিন্তা-ভাবনা শুরু করেছিলেন। আর্থিক সংকট, সিস্টারদের সংখ্যাস্বল্পতা, দেশীয় সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং স্বাধীনতা পরবর্তীকালে হাসপাতালের একদল উগ্রবাদী কর্মচারীর দাবী ও আচরণ সিস্টারদের হাসপাতাল হস্তান্তর করার সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা ও ত্বরান্বিত করে। বিভিন্ন বিষয়াদি আলাপ-আলোচনা শেষে মত দেয়া হয় যে, বাংলাদেশের কাথলিক মণ্ডলীতে হাসপাতাল পরিচালনায় পর্যাপ্ত জনবল না থাকাতে মণ্ডলী এ মুহূর্তে হাসপাতালের দায়িত্ব গ্রহণে প্রস্তুত নয়। সিস্টারদের অনুরোধে International Red Cross সিস্টার সম্প্রদায়কে আফ্রিকার ঘানায় একটি সেবামূলক হাসপাতাল স্থাপনে প্রয়োজনীয় জমি ও রসদ সরবরাহ করার শর্তে রাজী হয়। '৭৩ এর শুরুতে কোনো এক সকালে সিস্টারগণ International Red Cross এর প্রতিনিধি নিয়ে রমনা থানার পুলিশ সমভ্যিহারে ক্যাফেটেরিয়ায় আয়োজিত কর্মচারী-কর্মকর্তাদের সমাবেশে উপস্থিত হয়ে হাসপাতালটি International Red Cross এর নিকট হস্তান্তরের ঘোষণা দেন।

বঙ্গবন্ধুর বড় ছেলে শেখ কামাল ছিল ঢাকার শাহীন স্কুলের তুখোড় বাস্কেটবল খেলোয়াড়। স্কুলে থাকাকালীন সময়কার বন্ধুত্ব আরো গভীর হয় ঢাকা কলেজে পড়াকালীন সময়ে উনসত্তরের গণআন্দোলনের বিভিন্ন সভা-সমাবেশ আর মিছিলে। শেখ কামালের বন্ধু হিসেবে নিমন্ত্রিত হয়ে কামাল-জামাল দুই ভাইয়ের বিবাহোত্তর সংবর্ধনায় যোগ দিয়ে দেখেছিলাম আর এক রূপ। শেখ কামাল, শেখ জামালের বিবাহোত্তর সংবর্ধনায় গণভবনে গিয়ে দেখেছি কি সহজ-সরলভাবে একজন রাষ্ট্রনায়ক অতিথিদের আবাহন এবং আপ্যায়ন করেন ।

ঢাকা মেডিকেলে চতুর্থ বর্ষে অধ্যয়নকালে শেখ মুজিরকে দেখেছি আরেক রূপে। একটা প্রচলিত প্রথা ছিল চতুর্থ বর্ষে কলেজ ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অনুদানে Community Medicine Department ছাত্র-ছাত্রীদের Hygiene Tour এ নিয়ে যায়। বাজেট ঘাটতির কারণে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় অপারগতা জানালে আমি, জালাল, কনক কান্তি ও মাসুদ সন্ধ্যায় তাঁর বাসায় যাই। তিনি আমাদের দুই শতাধিক ছাত্র-ছাত্রীর বেদনার কথা উপলব্ধি করলেন এবং পরবর্তীতে বিশেষ তহবিল থেকে অর্থ বরাদ্দ দিলেন না ছাত্রদের ব্যয় সংকোচের জন্যে বিভিন্ন সরকারী Rest/ Guest হাউজের ব্যবস্থা করে দিলেন।

বর্তমান গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া গ্রামের শেখ লুৎফুর রহমান ও সাহেরা খাতুনের ঘরে ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে ১৭ মার্চ (বাংলা ২০ চৈত্র ১৩৫৯) শেখ মুজিবুর রহমান জন্মগ্রহণ করেন। শেখ মুজিব টুঙ্গিপাড়া গিমাডাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে প্রাথমিক শিক্ষা শেষে গোপালগঞ্জ মিশন হাই স্কুল থেকে ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে মেট্রিক পাস করেন। ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার ইসলামিয়া কলেজ থেকে আইএ (এইচএসসি) এবং ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইতিহাসে বিএ পাস করেন। গোপালগঞ্জ মিশন হাই স্কুলে অষ্টম শ্রেণিতে থাকাকালীন ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের জন্য মুজিব সাত দিন কারাভোগ করেন। তাঁর কন্যা শেখ হাসিনা 'শেখ মুজিব আমার পিতা' বইতে বলেন, "কৈশোরেই তিনি খুব অধিকার সচেতন ছিলেন। একবার যুক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা গোপালগঞ্জ সফরে যান এবং স্কুল পরিদর্শন করেন। সেই সময় সাহসী কিশোর শেখ মুজিব তাঁর কাছে স্কুল ঘরে বর্ষার পানি পড়ার অভিযোগ তুলে ধরেন এবং মেরামত করার অঙ্গীকার আদায় করে সবার দৃষ্টি আর্কষণ করেন।" স্কুলে থাকাকালীন সময়েই তিনি দান ও সমাজকল্যাণমূলক কার্যকলাপে যুক্ত হন। বঙ্গবন্ধুর এক স্কুল মাস্টার একটা সংগঠন গড়ে তুলেন যার সদস্যরা বাড়ি-বাড়ি ঘুরে ধান, চাল, টাকা যোগাড় করে গরীব মেধাবী ছাত্রদের সাহায্য করতেন। বঙ্গবন্ধু তাঁর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' তে লিখেন, "মাস্টার সাহেব গোপালগঞ্জে একটা মুসলিম সেবা সমিতি গঠন করেন, যার দ্বারা গরীব ছেলেদের সাহায্য করতেন। মুষ্টি ভিক্ষার চাল উঠাতেন প্রত্যেক মুসলমানের বাড়ি থেকে। প্রত্যেক রবিবার আমরা থলি নিয়ে বাড়ি-বাড়ি থেকে চাউল উঠিয়ে আনতাম এবং এই চাউল বিক্রি করে তিনি গরীব ছেলেদের বই এবং পরীক্ষার অন্যান্য খরচ দিতেন।"

নেতৃত্ব গুণের কারণে ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা ইসলামিয়া কলেজের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তিনি সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে ভর্তি হন। কিন্তু ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের ন্যায্য দাবি আদায়ের আন্দোলনকে সক্রিয়ভাবে সমর্থন করায় তাকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয় (৬১ বছর পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ১৪ আগস্ট, ২০১০ খ্রিস্টাব্দে শেখ মুজিবুর রহমানের বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করে নেয়)।

পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠী ক্ষমতা দখল করেই বাংলা ও বাঙালিকে পদানত রাখার পরিকল্পনা করে। প্রথমেই তারা উর্দূকে রাষ্ট্র ভাষা ঘোষণা করে আঘাত হানে বাংলা ভাষার ওপর। এর প্রতিবাদে বঙ্গবন্ধু ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ২ মার্চ ফজলুল হক মুসলিম হলে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠনের প্রস্তাব করেন এবং এর প্রেক্ষিতে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। ১৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু আমতলায় সভাপতি হিসেবে ভাষণ প্রদান করেন। বঙ্গবন্ধুর জবানিতে, "১৬ তারিখ সকাল ১০টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্রসভায় আমরা সকলেই যোগদান করলাম। হঠাৎ কে যেন আমার নাম প্রস্তাব করে বসল সভাপতির আসন গ্রহণ করার জন্য। সকলেই সমর্থন করল। বিখ্যাত আমতলায় এই আমার প্রথম সভাপতিত্ব করতে হলো' (অসমাপ্ত আত্মজীবনী)।

(চলবে)

যে সামগীত প্রার্থনা অর্পণ করছি আর্চবিশপ মজেস এম কস্তা'র প্রয়াণে

The Psalm I prayed from afar at the Passing of Most Rev. Archbishop Moses M. Costa csc.

ড. বার্থলমিয় প্রত্যুষ সাহা

The untimely passing away of Most Reverend Archbishop Moses M. Costa csc, through complications caused by Covid-19, was definitely most shocking for all who knew him and admired his life's dedication towards a simple religious life. He was an ever active, ever energetic person, committed to serving God and humanity. Endowed with many talents, he specialised in those areas of human services, especially pertaining to the character-building of young people and projects for the well-being of the communities he served. His attention was not only in responding to material needs of people, but also to spiritual and psychological needs.

I personally knew him for many years and we spent many fruitful hours sharing our thoughts and visions. My latest meeting with him was some time ago, at a Prayer Gathering with Holy Mass, for which he was the main celebrant. As I was leading the hymns at that Worship, he discussed with me about the choice of hymns and wanted to make sure that we sing the Sanctus (Punno, punno, punno Probhu; punno tumi) which I had composed many years ago, expressing how much he liked that piece. At that time he also asked me to compose a new melody for one of the new acclamations of the Mass, which I did and sent to him. He was so interested in new creations for the Liturgy and Worship.

During his days at the hospital, while I was getting updates of his health condition, I received one day the news that his latest Covid-19 test turned negative. I was so confident that he would recover fully within the next few days. But that was not so. On 13 July he breathed his last.

The Funeral Mass officiated by His Eminence, Cardinal Patrick D'Rozario csc, at the Patherghata Cathedral in Chattogram, was very moving and meaningful. His Homily was an inspiration amidst the shock and sadness amongst the faithful. Concelebrating the Holy Mass with Cardinal Patrick were several other Bishops and many Priests. At the end of the Mass some of them and other community leaders spoke about Archbishop Moses. The sacrifices and contributions that he made throughout his life were well remembered and recognised. There was a sincere expression of thanks and gratitude for the numerous achievements he accomplished for the communities.

How can we understand the pains and sorrows that this Coronavirus Pandemic is causing to people all over the world? So many lives are being lost. So many economies have been shattered. And, the Pandemic is still playing havoc. How can we accept the untimely passing of Archbishop Moses, who was such a kind and caring person? As the Funeral Mass was going on, these were some of the questions that lingered in my mind. A Psalm that stood out during those prayerful moments was Psalm 84. Archbishop Moses must have recited this Psalm many times during his lifetime. But now it seemed to be most fitting and appropriate, as he was being called by God to enter His eternal Kingdom. Sometime ago, I wrote and composed a Psalmgeet based on this very Psalm.And, that was my prayer song at the conclusion of the final funeral rites.

পরম শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ মজেস এম কস্তা সিএসসি'র কোভিড-১৯ রোগে আক্রান্ত হওয়ার কিছুদিন পরেই জানতে পারলাম যে তিনি ওই রোগমুক্ত হয়েছেন। বাংলাদেশের অনেক দূরে থাকলেও আমি প্রায়ই তাঁর পরিস্থিতির খোঁজ নিতাম। ভেবেছিলাম আর কিছু দিনের মধ্যেই তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ঢাকার হাসপাতাল থেকে তাঁর চট্টগ্রাম আর্চডাইয়োসিসে ফিরে যাবেন। কিন্তু তা আর হলো না। বিগত ১৩ জুলাই পরম প্রভুর ডাকে তিনি অনন্তযাত্রায় পাড়ি দিলেন।

করোনাভাইরাসের এই দুঃখ-কষ্ট, জ্বালা-যন্ত্রণা আমরা কিভাবে গ্রহণ করি? কত যে সুস্থ, প্রাণবন্ত জীবন এরই মধ্যে বিলীন হয়ে গেছে। কত যে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো হয়ে গেছে বিধ্বস্ত। এই ভয়ঙ্কর ভাইরাসের দাপট এখনও তো শেষ হলো না। আর্চবিশপ মজেসের এমনি হঠাৎ চলে যাওয়া কি করে আমরা মেনে নেই? যে মানুষটি সারাজীবনই করে গেছেন সুন্দর, সরল, ধর্মীয় জীবনের সাধনা, যিনি সকলের মঙ্গল সাধনেই উৎসর্গ করে গেছেন নিজেকে, তাঁর এমন অকাল মৃত্যু কি করে গ্রহণ করি?

এমনি কিছু ভাবনা নিয়েই দূর থেকে অংশ নিচ্ছিলাম আর্চবিশপ মজেসের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া খ্রিস্টযাগ অনুষ্ঠানে, যা চট্টগ্রাম ক্যাথিড্রাল গির্জা থেকে ১৪ জুলাই সরাসরি সম্প্রচারিত হয়েছিল। ওই প্রার্থনাময় মুহূর্তগুলোতে পবিত্র বাইবেলের একটি সামসঙ্গীত বারবার আমার মনে জাগছিল, সামসঙ্গীত নং ৮৪। এই সামসঙ্গীতটি আর্চবিশপ মজেস জীবিতকালে নিশ্চয়ই বহুবার প্রার্থনা করে গেছেন। কিন্তু এখন, পরম প্রভুর অনন্ত রাজ্যে প্রবেশ করার ডাকে সাড়া দিতে এটিই হলো তার শেষ মিনতি ও তার চূড়ান্ত প্রার্থনা।

কয়েক বছর পূর্বে এই সামসঙ্গীতটির ভিত্তিতে ও অনুপ্রেরণায় আমার প্রাণে একটি 'সামগীত' এসেছিল। তা-ই যেন বারবার অনুরণিত হতে লাগল অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ওই শেষ মুহূর্তগুলোতে।

সামগীত : তোমার আবাস গৃহ

তোমার আবাস গৃহ কত মনোরম
বিশ্বপ্রভু কত সুন্দর ওই পুণ্যধাম ।

১ । ব্যাকুল আমি তাইতো এখন;
প্রাঙ্গণে তোমার ধায় দেহ মন ।
তীর্থ যাত্রায় এ মোর প্রাণ
ক'রে যায় তোমারই গৌরব গান ।

২ । চড়াই পাখীও বাসা খুঁজে পায়
দোয়েলও পায় তার শাবক রেখেছে যে বাসায় ।
বিশ্বপ্রভু বেদী প্রান্তে তোমার
বন্দনা করে যাই, করি বার বার ॥

তোমার আবাস গৃহ

কথা, সুর ও স্বরলিপিঃ ড. বার্থলমিয় প্রত্যুষ সাহা

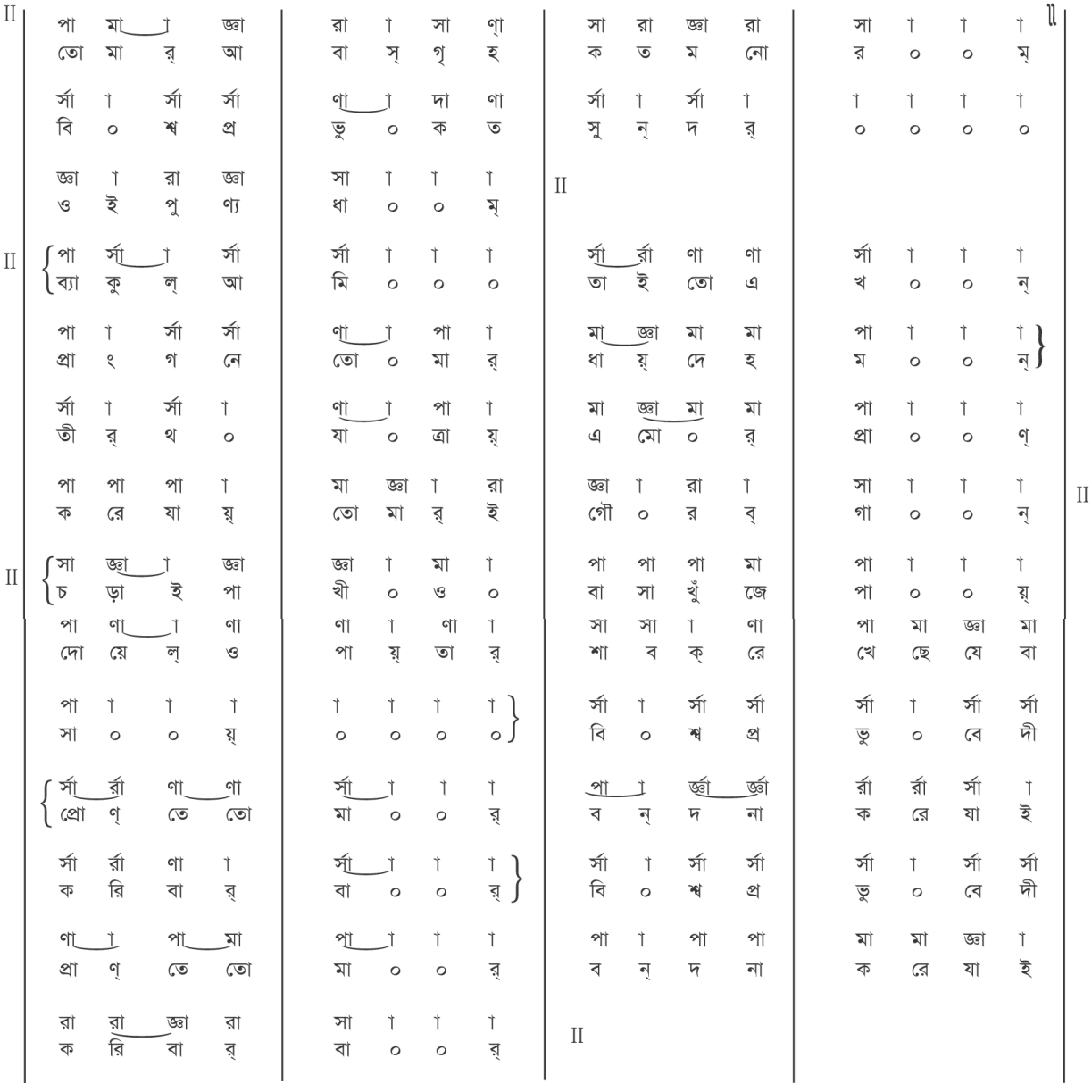

খ্রিস্ট মণ্ডলীতে মারীয়ার পর্ব

কাথলিক মণ্ডলীর উপাসনায় মা-মারীয়ার প্রতি ভক্তি-সম্মান প্রদর্শন ও প্রার্থনা বিভিন্ন পর্বের মধ্যদিয়ে করা হয়। সর্বোপরি, মারীয়া জগতের রাণী, পরিবারের রাণী এবং ভক্ত-বিশ্বাসীর রক্ষাকারিনী। মারীয়া নির্মলা, অমলোদ্ভবা, ঈশ্বরের জননী, নবীনা হবা'সহ বহুবিধ সম্মানে ভূষিত। মণ্ডলীতে মারীয়ার বিভিন্ন পর্ব উদ্‌যাপনের প্রথা বহু পুরনো। পর্ব উদ্‌যাপনের মধ্যদিয়ে মা মারীয়ার জীবনের বিভিন্ন দিকগুলো ফুটে ওঠে এবং মণ্ডলী বিভিন্ন যুগে শিক্ষা ও দর্শনের মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করে। জপমালা বা মারীয়া বিষয়ক প্রার্থনা কোন সংস্কারীয় বিষয় নয় তবে এটি বিশ্বাসীদের জনপ্রিয় একটি প্রার্থনা এবং প্রচলিত লোকভক্তি যা সারা বিশ্বে বিদ্যমান। পঞ্চম শতাব্দী থেকে খ্রিস্টপ্রসাদীয় প্রার্থনায় মা মারীয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। মা মারীয়ার উদ্দেশে পালিত পর্বগুলো তিন ভাগে বিভক্ত- যথা: মহাপর্ব, পর্ব ও স্মরণ দিবস। স্থানীয় মণ্ডলীর বিশ্বাস ও মা মারীয়ার দর্শনের উপর নির্ভর করে পর্বগুলো উদ্‌যাপন করা হয়ে থাকে। কাথলিক মণ্ডলীতে পালনীয় মারীয়ার পর্বগুলো হল:

১) ঈশ্বর জননী ধন্যা কুমারী মারীয়ার মহাপর্ব (Mary, Mother of God): ১ জানুয়ারি

খ্রিস্টবর্ষের প্রথম দিন ১ জানুয়ারী মা মারীয়ার পর্ব দিয়ে নতুন বছরের যাত্রা শুরু হয়। নববর্ষের এই দিনটি প্রধানত তিনটি কারণে স্মরণীয়, **প্রথমত:** ঈশ্বরজননী পুণ্যময়ী মারীয়ার মহাপর্ব, **দ্বিতীয়ত:** বিশ্ব শান্তি দিবস এবং **তৃতীয়ত:** খ্রিস্টীয় নববর্ষ। "তোমার শরণ নিচ্ছি, ওগো পুণ্যময়ী ঈশ্বর-জননী", চতুর্থ শতাব্দীর এই প্রার্থনাটি মা মারীয়ার প্রতি সবচেয়ে প্রাচীন প্রার্থনা। এই প্রার্থনাটিতে মারীয়াকে "ঈশ্বর-জননী" বলে প্রথম সম্বোধন করা হয়। মা মারীয়া ঈশ্বর জননী তত্ত্বটি নিয়ে ভ্রান্ত শিক্ষা প্রচার করে নেস্টোরিয়াস নামক একজন সন্ন্যাসী যিনি ছিলেন কনস্টান্টিনপলের আর্চবিশপ। এই ভ্রান্ত শিক্ষাকে প্রতিহত করার জন্য সাধু পোপ তৃতীয় সিক্সতুস (৪৩২-৪৪০) এফেসাস নগরে ৪৩১ খ্রিস্টাব্দে একটি মহাধর্মসভা আহ্বান করেন। দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর আলেকজান্দ্রিয়ার বিশপ শিরিল (৩৭৬-৪৪৪) পোপের মুখপাত্র হয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা দেন: "যিশু খ্রিস্ট প্রকৃত ঈশ্বর ও প্রকৃত মানুষ আর যে-মানবী সেই ঐশ ব্যক্তিকে গর্ভধারণ করে তাঁকে মানব-সত্ত্বা দান করেছেন, সেই এক ও অভিন্ন ব্যক্তির মাতা মারীয়াকে সমুচিতভাবে 'ঈশ্বর-জননী' বলে সম্বোধন করা হয়।" ঈশ্বর-জননী মারীয়া বুঝাতে তখন গ্রীক শব্দ Theototocos ব্যবহার করা হয়েছিল যার অর্থ মারীয়া ঈশ্বর যিশুর মাতা। এই দিনে আনন্দের সঙ্গে স্মরণ করা হয়, "অরূপ যিনি, তিনি ধরা দিয়েছেন মানবদেহ-রূপে; ঈশ্বর-সঞ্জাত, কালাতীত যিনি, তিনি এক মানবীর সন্তান হয়েছেন, ধরা দিয়েছেন কালের সীমায়।" এই সভার পরে মা মারীয়ার সম্মানে 'মেরী মেজর' ব্যাসিলিকাটি পুনঃসংস্কার করা হয়। রোমের প্রধান চারটি ব্যাসিলিকার মধ্যে এটি একটি।

২) দীনদরিদ্রের সঙ্গিনী ধন্যা কুমারী মারীয়া (Mary, Virgin of the Poor): ১৫ জানুয়ারি, স্মরণ দিবস

দীনদরিদ্রের সঙ্গিনী ধন্যা কুমারী মারীয়ার পর্বটি বেলজিয়ামে বিশেষভাবে জনপ্রিয়। মা মারীয়ার দর্শনের অন্যতম একটি স্থান হলো বেলজিয়ামের পাহাড়িয়া গ্রাম বানো (Banneux)। এই বানোতে ১২ বছরের মেয়ে মারিয়েটে বেকোর নিকট মা মারীয়া ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে আটবার দর্শন দেন। প্রথমে ১৫ জানুয়ারি এবং পরে ১৮ জানুয়ারি সন্ধ্যায় প্রার্থনা করার সময় মা মারীয়া মারিয়েটকে বাগানে দেখা দেন। মারীয়া তাঁর সঙ্গে রোজারীমালা জপ করেন এবং বনের প্রান্তে একটি ছোট ঝর্ণার কাছে মারিয়েটকে নিয়ে গিয়ে বললেন: "জলের ভেতরে হাত দাও, এই ছোট্ট ঝর্ণা আমার জন্যে নিবেদিত থাকবে।" এরপর মা মারীয়া আরও ছ'বার দেখা দিয়ে মারিয়েটে নিজের পরিচয় দিয়ে বলেন: "আমি দরিদ্রদের সঙ্গিনী। এই ঝর্ণা রাখা হবে সকল জাতির সকল মানুষের জন্যে, বিশেষভাবে রোগী মানুষের দুঃখ লাঘব করার জন্যে।" তিনি আরও বলেন: "আমি এখানে একটি ছোট্ট গির্জিকা চাই। আমি রোগী মানুষের কষ্ট লাঘব করতে এসেছি। ... আমার স্নেহের মেয়ে, সমস্ত প্রাণ দিয়ে প্রার্থনা কর।" মারিয়েটে বানো শেষ দর্শন লাভ করেন ২রা মার্চ ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে এবং মারীয়া তাকে নিজের পরিচয় দিয়ে বলেন: "আমি মুক্তিদাতার জননী, আমি ঈশ্বর-জননী।"

৩) প্রভু যিশুর নিবেদন পর্ব (The Presentation of the Lord): ২ ফেব্রুয়ারি

ইহুদী সমাজে মোশীর বিধান অনুসারে নবজাত শিশুকে মন্দিরে নিবেদন করার প্রচলন ছিল। এই প্রথাকে স্মরণ করে মারীয়া ও যোসেফ যিশুর জন্মের চল্লিশ দিন পর জেরুসালেম মহামন্দিরে তাঁকে পিতার নিকট উৎসর্গ করেছিলেন। উল্লেখ্য যে, পুরাতন নিয়মের রীতি অনুযায়ী প্রথম পুত্র সন্তান ঈশ্বরের কাছে নিবেদিত মানুষ হয়ে উঠবে। সন্তান নিবেদনের সাথে-সাথে ঈশ্বরের উদ্দেশে বলি দানও করা হতো। মারীয়া ও যোসেফও যিশুকে মন্দিরে নিবেদন করার সময় সকল ধর্মবিধি মেনে এক জোড়া পায়রা উৎসর্গ করেছিলেন। চতুর্থ শতাব্দীর শেষের দিকে জেরুসালেমে 'মন্দিরে যিশুকে নিবেদন পর্বটি' প্রথম পালিত হয়। এই পর্বে স্মরণ করা হয় যে, মারীয়া ও যোসেফ যিশুর জন্মের চল্লিশ দিন পরে মোশীর বিধান অনুযায়ী জেরুসালেমের মহামন্দিরে গিয়ে তাকে তাঁর পরম পিতার চরণে নিবেদন করেছিলেন। প্রাক্তন-সন্ধির নিয়ম অনুসারে প্রথম পুত্র-সন্তান মাত্রই ছিল ঈশ্বরের কাছে নিবেদিত মানুষ। সন্তানকে ফেরত পাওয়ার জন্য পিতামাতা তার জন্যে মুক্তিপণ হিসাবে একটি মেষশাবক বা একজোড়া পায়রা দিতো, যা প্রথম-জাতকের পরিবর্তে বলিদান করা হত। নতুন নিয়মের শিক্ষা অনুসারে "যিশু এক নবসন্ধি স্থাপন করতে এসেছেন, তিনি এবার মানবজাতির প্রথম-জাতক হয়ে মানবজাতির জন্যে মুক্তিপণ হিসেবে মেষশাবক বা পায়রা নয়, বরং নিজেকে নিবেদন করবেন। তাঁর জীবন হল এক আত্মোৎসর্গ যা পূর্ণ হবে কালভেরী পর্বতে।"

(চলবে)

বন্ধুভাবাপন্ন হও

প্রত্যেকেই সম্ভাবনাময় বন্ধু। প্রত্যেক ব্যক্তি তোমার বন্ধু হতে পারে। বন্ধুত্বের জন্য তিনটি মনোগত বিষয় আবশ্যিক :

বিশ্বাস, আশা ও ভালবাসা

ঈশ্বর নিজেই তোমাকে পথ দেখিয়েছেন। তিনি তোমাকে তাঁর বন্ধু করতে প্রথম পদক্ষেপ নিয়েছেন। তিনি যখন তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, তোমার অন্তরে এ তিনটি দান তিনি তোমাকে দিয়েছেন। বন্ধুত্ব করতে তোমাকে এ দানগুলি অন্যদের সাথে সহভাগিতা করতে হবে।

তোমার বন্ধু আছে বা নেই তা নির্ভর করে তোমার ওপর॥

প্রার্থনা

প্রেমময় ঈশ্বর সত্যি তুমি আমার বন্ধু! আমার উপর তোমার বিশ্বাস, আশা ও ভালবাসা যা এক বন্ধুত্বের গভীর প্রত্যয় এনে দিয়েছে। বাস্তব জীবনের যাত্রায় বন্ধু মনোনয়নে যেন তোমার এ বিশেষ তিনটি দান কাজে লাগাতে পারি এবং বন্ধুসহ জীবন-যাপন করতে পারি, এ বর প্রদান কর। - আমেন।

বইঃ ৬০টি উপায়, নিজেকে বিকশিত হতে দাও

** মূল লেখক: মার্থা মেরী মনগ্যা সিএসসি*

** অনুবাদক : রবি খ্রিস্টফার ডি'কস্তা (প্রয়াত)*

অনুধ্যান

(নিজে কর)

… … … …
… … … …

মমতাময়ী মা মারীয়া

সংগ্রামী মানব

দুঃখভাগিনী, অনুতাপসীনি
মৃত্তিকা আঁকড়ে ধরেছ
পুত্র মৃত্যু সনে।
দুঃখজনক চাহনি
তোমাকে করেছে গ্রাস,
ছেলে বলেছে;
দুঃখ করো না,
আনন্দ কর, কর উল্লাস।
নিঃস্বার্থ ত্যাগ তোমাতেই বিদ্যমান
অফুরন্ত প্রেম তোমাতেই দৃশ্যমান।
সদা-সর্বদা করেছ ভক্তি
ঐশপরিকল্পনা করলে মুক্তি।
অসীম তোমার মহত্ত্ব
প্রতিটা জানু আজ নত মস্তকে
তোমায় প্রণামে রত।
ওগো মা বিপদে মোদের রক্ষা কর
সুখে হও সঙ্গী
এই মোদের আকুতি॥

বিচিত্র জীবন

ইভেট মিথিলা নাথারিয়েল

ছোট এ জীবন, ক্ষুদ্র পথ চলা,
ছোট এই জীবনের বিচিত্র পথে গমন
ক্ষুদ্র এ জীবনে বিচিত্র মানুষের আগমন।

ভালো মানুষের বেশ ধরে ভণ্ড লোক ঠকায়,
সত্যিকারের ভালো মানুষগুলো চিরকালই কষ্ট পায়।

অন্য ধর্মের অশ্রদ্ধা করা সে তো অহংকার নয়,
বরং সব ধর্মকে শ্রদ্ধা করাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম হয়।
সম্প্রদায়িকতার বেড়াজালে আজ বিশ্ব আবদ্ধ
একই সৃষ্টিকর্তার মানুষ ধর্ম নিয়ে করে যুদ্ধ।

চরিত্রহীন বড়লোকেরা পায় সম্মান,
সহজ-সরল গরীব মানুষকে করা হয় অপমান।
ভালোবাসা খোঁজে না মানুষ, খোঁজে শুধু টাকা,
মানুষের বিবেক আজ ময়লার স্তুপে পড়েছে ঢাকা।

মানুষ আজ একে-অপরকে ধ্বংসলীলায় ব্যস্ত,
মানুষ এখন মনুষ্যত্বহীন, হারিয়ে গেছে অস্তিত্ব।
ভণ্ড-মিথ্যাবাদীতে আজ জগত পরিপূর্ণ
কবে পাল্টাবে দিন, কবে হবে এ দেয়াল বিচূর্ণ?

ঢাকা আর্চডাইওসিসের ন্যায় ও শান্তি কমিশনের কোভিড -১৯ পরবর্তী নতুন স্বাভাবিক জীবন বিষয়ক সেমিনার

নিজস্ব প্রতিবেদক ▮ গত ১০ জুলাই ২০২০ খ্রিস্টাব্দে নাগরী ধর্মপল্লীতে ঢাকা আর্চডাইওসিসের ন্যায় ও শান্তি কমিশনের কোভিড -১৯ পরবর্তী নতুন স্বাভাবিক জীবন বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এতে ধর্মপল্লীর পালকীয় পর্ষদের সদস্যগণ, ফাদার-ব্রাদার ও সিস্টারগণ, গ্রাম প্রধানগণ, ক্রেডিট ইউনিয়নের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যসহ ৪৮জন নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। সেমিনারের কর্মসূচির মধ্যে ছিল- প্রার্থনা, করোনাভাইরাস পরবর্তী আর্থ-সামাজিক অবস্থা পর্যালোচনা, নিজের প্রস্তুতি ও করণীয় বিষয়ক উপস্থাপনা। ধর্মপল্লীতে করোনাভাইরাস দুর্গতিতে খ্রিস্টভক্তদের আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও নৈতিক বিষয়ে আলোচনা করেন পালক-পুরোহিত ফাদার জয়ন্ত এস গমেজ। এছাড়াও কোভিড-১৯ পরবর্তী আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও করণীয় বিষয়সমূহ উপস্থাপন করেন ওর্য়াল্ড ভিশন এশিয়া প্যাসিফিক কার্যক্রম সমন্বয়কারী চন্দন জেড গমেজ এবং মাণ্ডলিক ও পোপ ফ্রান্সিসের নির্দেশনাসমূহ আলোকপাত করেন ন্যায় ও শান্তি কমিশনের সেক্রেটারি ফাদার লিটন এইচ গমেজ সিএসসি। সেমিনারের শুরুতে সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে এবং নিজেদের প্রতি আরও যত্নবান হওয়ার জন্য প্রার্থনা করা হয়।

বক্তাদের উপস্থাপনা ও উন্মুক্ত আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ ছিল- দায়িত্বশীল পরিবার গঠন, সুন্দর জীবনযাপন, স্বামী-স্ত্রীর অঙ্গিকার রক্ষা, বিপদাপন্ন আপনজনদের সেবাযত্ন করে পারিবারিক পরিবেশ সুন্দর করে তোলা। পরিবারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদক্ষেপ– প্রয়োজন মাফিক কেনাকাটা, পরিমিত রান্না ও অপচয়রোধ, পরিমিত ও স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যাভ্যাস, জিনিসপত্র পুনঃব্যবহার করে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে সহযোগিতা করা। বাড়িতে বিদ্যুৎ, গ্যাস, টেলিভিশন, পানির কল, বৈদ্যুতিক পাখা ব্যবহারের পর বন্ধ রাখতে সর্বদা সচেতন থাকা। ক্রেডিট ইউনিয়নের নেতানেত্রীগণ যেন আরো সক্রিয় ও বিচক্ষণতার সাথে করোনাভাইরাস দুর্গতির সময়ে সদস্যদের সহযোগিতা করতে পারে এ বিষয়েও আলোচনা করা হয়। একটি মানবিক পরিবেশ রক্ষার জন্য পরস্পরের প্রতি আচার-আচরণে শিষ্টাচার অনুসরণ, দলীয়করণ মনোভাব ও অযাচিত তোষামোদপ্রিয় স্বভাব, অতিভোগ ও নিয়ন্ত্রণহীন উৎসব সম্পর্কে সতর্ক থাকতে বলা হয়।

করোনাকালীন সময়ে জীবন ও প্রাকৃতিক সম্পদের প্রতি আরও বেশি যত্নবান ও রক্ষণাবেক্ষণ মনোভাব গড়ে তোলা এবং ব্যক্তিগতভাবে, পারিবারিকভাবে, ধর্মপল্লীভিত্তিক এবং কর্মস্থলভিত্তিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্যোগে ব্রতী হওয়ার আহ্বান রাখা হয়।

পরিশেষে পাল-পুরোহিত ফাদার জয়ন্ত এস গমেজ অংশগ্রহণকারীদের ধন্যবাদ জানিয়ে সেমিনারের সমাপ্তি ঘোষণা করেন॥

ভুল সংশোধনী

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী সংখ্যা - ২৭

- ৫নং পৃষ্ঠার শিরোনামে 'আযাহ' এর স্থলে 'আয্হা'
- ৮নং পৃষ্ঠার শিরোনামে 'সৌহার্দ্য' এর স্থলে 'সৌহার্দ' ও 'মনের পশুকে নয়, বনের পশুকে' এর স্থলে 'বনের পশুকে, মনের পশুকে'
- ২২নং পৃষ্ঠার শেষের সংবাদে ২য় প্যারার ৪র্থ লাইনে '১৯৬৪' এর স্থলে '১৯৬৮' পড়তে হবে।

অনাকাঙ্ক্ষিত বানান ও তথ্যগত ভুলের জন্যে আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

সম্পাদক

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

পাওয়া যাচ্ছে! পাওয়া যাচ্ছে!! পাওয়া যাচ্ছে!!!

প্রতিবেশী প্রকাশনীতে ধর্মীয় দ্রব্যাদির আকর্ষনীয় সম্ভার।

- ✶ রেডিয়ামের বিশেষ রকমের মূর্তি
- ✶ পানপাত্র
- ✶ আকর্ষনীয় নতুন ক্রুশ ও রোজারিমালা
- ✶ এছাড়াও সাধু-সাধ্বীদের জীবনী বই

এছাড়াও যা পাওয়া যাচ্ছে –

❒ খ্রিস্টযাগ রীতি ❒ খ্রিস্টযাগ উত্তরদানের লিফলেট
❒ ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর বই
❒ কাথলিক ডিরেক্টরী ❒ এক মলাটে নির্বাচিত কলামগুচ্ছ
❒ যুগে যুগে গল্প ❒ সমাজ ভাবনা

আপনাদের পরিবার খ্রিস্টীয় আদর্শে গড়ার লক্ষ্যে ধর্মীয় দ্রবাদি ব্যবহার করুন ও ধর্মীয় বই পড়ুন।

শিঘ্রই পাওয়া যাবে

অতি আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে প্রতি বছরের ন্যায় এই বছরও প্রতিবেশী প্রকাশনী দৈনিক বাইবেল পাঠ (**বাইবেল ডায়েরী ২০২১** - **BIBLE DIARY** - Daily Prayer Book) ভারত থেকে আমদানী করছে। তাই আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী আজই অর্ডার দিন।

প্রতিবেশী প্রকাশনী প্রতি বছরের ন্যায় এবারও আগামী **২০২১ খ্রিস্টাব্দের বাইবেল ভিত্তিক খ্রিস্টীয় ক্যালেন্ডার ছাপার প্রস্তুতি নিচ্ছে।** আপনার প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপনটি প্রতিবেশী প্রকাশনীর ক্যালেন্ডারে প্রকাশের জন্য আজই যোগাযোগ করুন।

-যোগাযোগের ঠিকানা -

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
হলি রোজারি চার্চ
তেজগাঁও, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
সিবিসিবি সেন্টার
২৪/সি আসাদ এভিনিউ, মোহম্মদপুর, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
নাগরী পো: অ: সংলগ্ন
গাজীপুর।

বর্ষ ৮০ ❖ সংখ্যা- ২৮
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 28
Regd. No. DA-33
❖ 9 - 15 August, 2020 , ২৫ - ৩১ শ্রাবণ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

২য় মৃত্যুবার্ষিকী

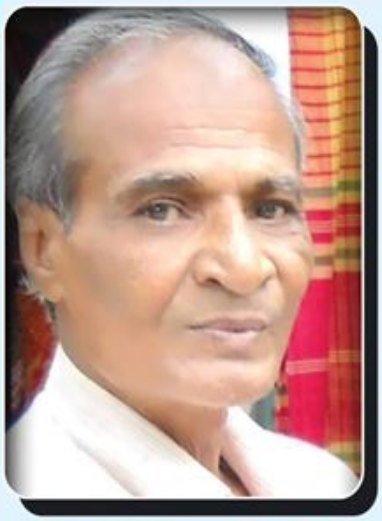

প্রয়াত রঞ্জন লরেন্স রোজারিও
জন্ম : ১১ আগস্ট, ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১৩ আগস্ট, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম: তুমিলিয়া, ধর্মপল্লী : তুমিলিয়া

"মরণের পরে যেন তোমারই কাছে যাই
আমরা সবাই একদিন যেন স্বর্গেতে স্থান পাই
সেথায় হবে তোমার সাথে মহামিলন"।

আমাদের বাবা ছিলেন একজন সাধাসিধে মানুষ, গ্রাম ও মণ্ডলীর সেবায় সবসময় অংশ নিতেন। বাবা হিসেবে তার সন্তানদের তিনি খুবই ভালবাসতেন। আজ বাবাকে হারিয়ে আমরা এক বুক ভরা কষ্টে জর্জরিত ও বাবার ভালবাসা হতে বঞ্চিত সন্তান। বিশ্বাস করি, প্রেমময় ঈশ্বর আমাদের বাবাকে তাঁর স্বর্গের বাগানের প্রয়োজনেই দীর্ঘ বছর বেঁচে থাকা সময়ের আগেই তুলে নিয়ে গেলেন। আর এ বিশ্বাস থেকেই আজ বাবার কাছে অনুনয় করি, তিনি যেন ঈশ্বরের সেই স্বর্গীয় বাগান হতে অসীম কৃপা আশীর্বাদ আমাদের জন্যে বর্ষণ করেন এবং আমরা যেন মাকে নিয়ে তার রেখে যাওয়া আদর্শগুলো আমাদের জীবন চলার পথে পাথেয় করে চলতে পারি। ঈশ্বর বাবার আত্মাকে চিরশান্তি দান করুন।

শোকাহত পরিবার –
স্ত্রী: চারু স্কলাষ্টিকা গমেজ
ছেলে-ছেলে বউ : চন্দন-এডলিন, চয়ন-মিতালী, চপল-রত্না
মেয়ে-মেয়ে জামাই : চন্দনা-সঞ্জিত, সিস্টার বন্দনা (ওএসএল) ও চপলা
নাতি-নাতনি: জুডিথ, সুস্বপ্ন, জয়িতা, জয়মিতা, রুদ্র, রিথান স্টারলি
বোন : পারুল, মণিকা ও রঞ্জনি এবং পরিবারবর্গ

বিজ্ঞ/১২৭/২০

কলেজ কোড : ৭৩১৪ কলেজ EIIN : 137031

নটর ডেম কলেজ ময়মনসিংহ

এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের জানাই

অভিনন্দন

নটর ডেম কলেজ ময়মনসিংহ-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে ছাত্রদের নৈতিক মূল্যবোধ, সহনশীলতা, ন্যায়নিষ্ঠতা, সহমর্মিতা, দায়িত্ববোধ জাগ্রত করা এবং সমাজ, দেশ ও বিশ্বের প্রতি গভীর ও অকৃত্রিম ভালোবাসা জাগ্রত করার মধ্য দিয়ে সহানুভূতিশীল মানুষরূপে গড়ে তোলা।

২০২০-২০২১ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি

একাদশ শ্রেণিতে -Online এ ভর্তির আবেদনের ন্যূনতম যোগ্যতা:

- বিজ্ঞান বিভাগ জিপিএ - ৪.০০ (উচ্চতর গণিতসহ)
- মানবিক বিভাগ জিপিএ - ২.৫০
- ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ জিপিএ - ২.৫০
- বিজ্ঞান বিভাগ হতে ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ জিপিএ - ৩.০০

ভর্তি বিষয়ক বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন ● কলেজ ক্যাম্পাসে অবস্থিত তথ্য কেন্দ্র: কক্ষ নং-১০৪ (নিচ তলা)
মোবাইল ঃ ০১৯৮৭-০০৯১০০, ০১৫৫২-৩৪২১৩১ ● Website: www.ndcm.edu.bd ● বাড়েরা, বাইপাস মোড়, ময়মনসিংহ।

বিজ্ঞ/১২৬/২০

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com, Webpage link : www.weekly.pratibeshi.org**